বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ

২০২২

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

সপ্তদশ বর্ষ, সপ্তদশ সংখ্যা
জুন, ২০২২

মুখ্য সম্পাদক
ড. অদিতি দে (অধ্যক্ষ)

সম্পাদক
ড. শর্মিলা ঘোষ (বিভাগীয় প্রধান)

সহকারী সম্পাদক
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি
ড. শ্রাবন্তী মিত্র
দিশারী মুখার্জি

প্রকাশক
বাংলা বিভাগ
শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ
১১, লর্ড সিন্‌হা রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭১

মুদ্রক
প্রতিরূপ
৩৫, নন্দনা পার্ক
কলকাতা - ৭০০ ০৩৪

আমাদের কথা

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ২০২২ — সপ্তদশ বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যা। অতিমারির সংকট কাটিয়ে উঠে আমরা ক্রমশ আবার স্বাভাবিকতার পথে। আর ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই গত বছরের আন্তর্জালিক প্রকাশনার পর আবার আমাদের কাগজে কলমে আত্মপ্রকাশ।

কলেজের ছাত্রীদের কয়েকটি লেখার সঙ্গেই আন্তর্কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্বাচিত লেখাগুলি প্রকাশিত হল। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবারে আমরা বেশ কয়েকটি আমন্ত্রিত লেখা পেয়েছি। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক, আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. বীথি সরকার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শ্রাবণী পাল, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অর্পিতা ভট্টাচার্য তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমাদের কলেজের অধ্যাপক রম্যানি চট্টোপাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা দিয়েছেন, তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানের সহকর্মী এডুকেশন বিভাগের অতিথি অধ্যাপক সৌমিতা মিত্র একটি লেখা দিয়েছেন। তাঁর প্রতি রইল শুভ কামনা। বাংলা বিভাগের দুজন প্রাক্তনী — দেবলীনা দাশগুপ্ত এবং সৃজিতা ব্যানার্জী দুটি লেখা দিয়েছে। তাদের শুভাশিস জানাই।

বাংলা বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব এবারে হল অনলাইনে। ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা বিভাগের দুই প্রাক্তনী শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অর্পিতা সরকারের লেখায়।

বিভাগের সারা বছরের কাজকর্মের খতিয়ান রয়েছে পত্রিকার শেষে 'বিভাগের কথা'য়। আর রইল বিভাগের নানা অনুষ্ঠানের কিছু ছবি।

আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাবে নিশ্চিত। তার জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী। সামনের বছরগুলিতে আরও ভাল করে পত্রিকা প্রকাশের অঙ্গীকার রইল।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বাংলাভাষা দিবস ২০২২

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ

অনুষ্ঠান ঃ

- **আন্তর্জালিক আলোচনা সভা ঃ**

  বক্তা ঃ ডঃ মনন কুমার মণ্ডল
  বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
  অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ
  নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
  বিষয় ঃ 'একুশের দেশ' ঃ কল্প ও বাস্তবের সীমারেখা
  তরিখ ঃ ২১.০২.২০২২

- **আন্তর্জালিক আন্তর্কলেজ সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতা ঃ**

  ফলাফল ঃ—
  প্রথম ঃ বৃন্দা বৈশ্য সাহা, *লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ*
  দ্বিতীয় ঃ ঋষভ চ্যাটার্জি, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*
  তৃতীয় ঃ সুচেতনা গোস্বামী, *আশুতোষ কলেজ*

  ■ **বিশেষ প্রশংসিত রচনা ঃ**
  ১। অস্মিতা দত্ত, *বেথুন কলেজ*
  ২। সায়ন চক্রবর্তী, *আশুতোষ কলেজ*
  ৩। দেবপ্রতিম পট্টনায়ক, *ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি*

  বিচারক ঃ শ্রীমতী ভাস্বতী বোস, *বি.এড. বিভাগ*

✠✠✠✠✠✠✠

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ

বাংলা বিভাগ

বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (আন্তর্জালিক আন্তর্কলেজ প্রতিযোগিতা)

তারিখ ঃ ১১.০৪.২০২২

প্রতিযোগিতার ফলাফল

- বিতর্ক প্রতিযোগিতা ঃ

  প্রথম ঃ সৃজনী দাস, *বেথুন কলেজ*
  দ্বিতীয় ঃ তন্বী দাস, *লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ*
  যুগ্ম-তৃতীয় ঃ অস্মিতা দত্ত, *বেথুন কলেজ* ■ শতাব্দী নিয়োগী, *যোগমায়া দেবী কলেজ*
  বিচারক ঃ ডঃ অগ্নিতা কুন্ডু, *রসায়ন বিভাগ* ■ শ্রীমতী দেবলীনা গুহ ঠাকুরতা, *ইংরেজী বিভাগ*

- অণুগল্প লিখন প্রতিযোগিতা ঃ

  প্রথম ঃ অনুশ্রুতা দে, *লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ*
  দ্বিতীয় ঃ তুহিন দাস, *ম্যাকাউট ইউনিভার্সিটি*
  তৃতীয় ঃ ভূমিকা বোস, *লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ*
  বিচারক ঃ ডঃ মন্দার মুখোপাধ্যায়, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ*

- তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ঃ

  প্রথম ঃ সৃজনী দাস, *বেথুন কলেজ*
  দ্বিতীয় ঃ শতাব্দী নিয়োগী, *যোগমায়াদেবী কলেজ*
  তৃতীয় ঃ দেবজিৎ ভট্টাচার্য, *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*
  বিচারক ঃ ডঃ দেবলীনা সিন্‌হা, *ইতিহাস বিভাগ*

- আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ঃ

  প্রথম ঃ সৌমীষা ভট্টাচার্য, *যোগমায়া দেবী কলেজ*
  দ্বিতীয় ঃ শুভেচ্ছা মিত্র, *শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ*
  তৃতীয় ঃ প্রীতি আস্থানা, *শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ*
  বিচারক ঃ শ্রীমতী ভাস্বতী বোস, *বি.এড. বিভাগ*

- বিজ্ঞাপন লিখন প্রতিযোগিতা ঃ

  প্রথম ঃ অর্ণব ভট্টাচার্য, *শ্রীরামপুর কলেজ*
  দ্বিতীয় ঃ বিপাশা হাওলাদার, *ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*
  তৃতীয় ঃ দেবজিৎ ভট্টাচার্য্য, *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*
  বিচারক ঃ শ্রী ময়ূখ লাহিড়ী, *সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ*

বিষয় সূচি

		পৃষ্ঠা
কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যভুবন **অধ্যাপক গোপা দত্তভৌমিক** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রাক্তন উপাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	—	১
মাসাদা/এক বীরগাথা **ড. বীথি সরকার,** প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ	—	১৩
পল্লিপুনর্গঠনে রবীন্দ্রভাবনা ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা **ড. শ্রাবণী পাল,** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	—	১৭
বিদ্রোহী মানিক **অর্পিতা ভট্টাচার্য,** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ	—	২৩
অণুরণন ● রম্যানি চট্টোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ	—	২৮
আমার বাংলাকেন্দ্রিক জীবন ● সৌমিতা মিত্র, অতিথি অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ	—	৩০
বাংলা ভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতা (আন্তর্জালিক)		
■ *প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা* **আমি চাই নেপালি ছেলেটা গিটার হাতে** **আমি চাই তার ভাষাতেই গাইতে আসবে কলকাতাতে** **বৃন্দা বৈশ্য সাহা,** লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, বাংলা সাম্মানিক, চতুর্থ সেমেস্টার	—	৩১
■ *দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা* **ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে** **ঋষভ চ্যাটার্জী,** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	—	৩২
■ *তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা* **ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে** **সুচেতা গোস্বামী,** ইংরেজি অনার্স, তৃতীয় বর্ষ, আশুতোষ কলেজ	—	৩৩
■ *বিশেষ প্রশংসিত রচনা* **ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে** **দেবপ্রতিম পট্টনায়ক,** ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি	—	৩৪
■ *বিশেষ প্রশংসিত রচনা* **একুশ ● সায়ন চক্রবর্তী,** স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ	—	৩৬
■ *বিশেষ প্রশংসিত রচনা* **ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে** **অস্মিতা দত্ত,** সাইকোলজি বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার, বেথুন কলেজ	—	৩৭

পৃষ্ঠা

‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’-র “অণুগল্প” প্রতিযোগিতা

- *প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা*
  স্বপ্নের সে দিনে... — ৪০
  অনুশ্রুতা দে, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, ভুগোল বিভাগ, স্নাতকোত্তর, ৪র্থ সেমিস্টার
- *দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা*
  উদ্বায়ু — ৪২
  তুহিন দাস, ম্যাকাউট ইউনিভার্সিটি,
  ফরেন্সিক সায়েন্স বিভাগ, স্নাতকোত্তর, ৪র্থ সেমিস্টার
- *তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা*
  অন্য রকম বাঁচা — ৪৪
  ভূমিকা বোস, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, স্নাতকোত্তর, ৪র্থ সেমিস্টার

Alumni একটি আবেগ — ৪৬
অর্পিতা সরকার, প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ (২০০১-২০০৪)

প্রাক্তনী সম্মেলন (২০২১) সম্বন্ধে কিছু কথা — ৪৭
শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ (২০০১-২০০৪)

দশাবতার তাস তথ্য ● দেবলীনা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ — ৪৮

‘কমেডি অফ এররস’ বনাম ভ্রান্তিবিলাস; অনুবাদক হিসেবে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব — ৫০
সৃজিতা ব্যানার্জী, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

আমরা যারা লাল গোলাপী ● সমৃদ্ধা ঘোষ, ইংরেজি বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার — ৫৩

মাটি ● রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার — ৫৪

বিভাগের কথা (জুলাই ২০২১ — জুন ২০২২) — ৫৫

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যভুবন

অধ্যাপক গোপা দত্তভৌমিক
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ
প্রাক্তন উপাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

১.

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসংগ্রহের (ভারবি প্রকাশিত) পরিশিষ্টে কবির জ্যেষ্ঠপুত্র সুনীলকান্তি সেন মন্তব্য করেছেন, 'জীবদ্দশায় বা পরবর্তীকালে যতীন্দ্রনাথ বহু পরিচিত বা জনপ্রিয় কবি হননি। তার একটি কারণ বোধহয় তাঁর প্রচারবিমুখতা ও চরিত্রের এক বিশেষ কৌলীন্যবোধ।' তাঁর জন্ম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন আর মৃত্যু ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর — সুতরাং কালের একটি দূরত্ব থেকে দেখে কবিপুত্রের কথার সত্যতা মেনে নিয়ে বলা যায়, এই কবির জনপ্রিয়তা কিন্তু অন্তঃসলিলা। তাঁর বহু পঙ্‌ক্তিই এখনো লোকের মুখে মুখে ফেরে, অনেকেই সে সব পঙ্‌ক্তি প্রায় প্রবাদের মতো উচ্চারণ করেন, কে লিখেছেন সে বিষয়ে তেমন সচেতন না থেকে। কবি হিসেবে এই ধরণের জনপ্রিয়তা কিন্তু বিরলগোত্রের। একটি ভাবার নিহিত সম্পদ সম্পর্কে যে বাক্‌শিল্পী সম্পূর্ণ অবহিত এবং সাবলীল ভাবে সেই ঐশ্বর্য ব্যবহারে সক্ষম, যাঁর হাতে ভাষা ওস্তাদের হাতে বীণার মতো বেজে ওঠে — তাঁর ক্ষেত্রেই এমনভাবে ব্যাপারটা ঘটে যায়। মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদের বহু পঙ্‌ক্তি এমন ভাবে বাঙালির মুখের ভাষায় মিলিয়ে আছে। উনিশ শতকে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর সহজাত ছন্দোবোধ আর পরিহাস রসিকতায় এমন কিছু পঙ্‌ক্তি গেঁথে দিয়েছেন বাঙালির মনে। মধুসূদনের রচিত বহু পঙ্‌ক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা কণা এভাবে আমাদের বাগ্‌ভঙ্গিতে, প্রবাদে, সুভাষিতে অঙ্গে অঙ্গে মিলে গেছে। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোনো আকস্মিক ঘটনায়, মানবচরিত্রের চমকপ্রদ কোনো উল্লাসে হঠাৎ উচ্ছ্বাসে আমরা বলে ফেলি, 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে', 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়!' 'কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে', 'খুলিল পশ্চিমদ্বার অশনিনিনাদে', কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে', 'রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি', 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়', 'মরিতে চাহিনে আমি সুন্দর ভুবনে', 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা', 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'হযবরল' থেকে এমন অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় যা বাঙালির মুখে মুখে ফেরে। এই সব দ্যুতিময় গদ্য বা গদ্যের ভাঙা টুকরো কীভাবে যেন হয়ে ওঠে আমাদের সংলাপ। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ক্ষেত্রেও যে সব পঙ্‌ক্তিমালা আমাদের ঈষৎ অলঙ্কার শিঞ্জিত কথনে মিলে যায় তার সামন্য অংশ উদ্ধার করছি।

- চেরাপুঞ্জির থেকে
  একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে ?
- প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারেনা বারোটার বেশি রাতি।
- তুমি শালগ্রাম শিলা, —
  শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।
- মাল চেনাচেনি দর জানাজানি
  কানাকড়ি নিয়ে কত হানাহানি।

- আশি শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে —
  চির নাবালক চাষা।

- শহরে বরষা ঝরে
  মেঘদূত ঘরে ঘরে
  গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা

- বজ্রে যে-জনা মরে
  নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কে বা করে ?

- সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।

- কেহ কাঁদে কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
  ঘরে ফিরিবার বেলা।

- মরণ কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।

- বৌবাজারের মোড়ে
  যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস থোড়ে।

- কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
  বারমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস।

- কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।

এই তালিকা আর দীর্ঘ করে লাভ নেই, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে কীভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কবিতাপ্রেমিক বাঙালি গ্রহণ করেছে এ তারই সামান্য নিদর্শন। তাঁর বহু কবিতাই জনচিত্তজয়ী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুটি বিশেষণ তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে, রবীন্দ্রবিরোধী ও দুঃখবাদী। এই বিশেষণ দুটি কতোটা যুক্তিযুক্ত এই প্রবন্ধে তা আমরা বুঝে নিতে চাইব।

২.

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রবীন্দ্র বিরোধিতার কিন্তু তেমন কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই। শ্রী বিপ্রতীপ গুপ্ত ছদ্মনামে তিনি যে আত্মস্মৃতি লিখেছেন ১৩৫৬ সালে মাসিক বসুমতীতে, তার কিয়দংশ উদ্ধার করা যাক। শিবপুর বি.ই. কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তর্ক বেঁধেছে।

'বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেঁধেছে। মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় জন্মায়নি। যতীন উত্তপ্ত হয়ে জানায়, নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' যে পড়েছে সে ও কথা বলবে না। কিছুদিন পূর্বে আমরা কুরুক্ষেত্র পড়েছিলাম, মাইকেলের 'সীতা ও সরমা' অংশ, হেমচন্দ্রের 'অশোক তরু' প্রভৃতি দশ-বিশটা কবিতাও পড়া ছিল। বাল্যকালে পিসীমার কাশিরাম দাসের মহাভারতখানি যতীন দেখিয়ে লুকিয়ে কয়েকবার শেষ করেছিল। গ্রামের মুচিপাড়া ও মালোপাড়ায় বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি, গান দু-দশটা শুনেছি। মিহির মৃদু হসে বলল — নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথ কি তফাত সেটা বোঝাবার জন্য রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী

তোমাদের দেব, আগামী বর্ষাবকাশে পড়ে দেখ, তারপরে তর্ক কোরো। মিহির-প্রদত্ত আড়ে-দীঘে সমান, একখানি প্রকান্ড রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুরে এলাম। পড়ে দেখে আমরা তো অবাক। হায় নবীন সেন! এই বিদ্যে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণপ্রায়। যতীন বললে, ধরিত্রী দ্বিধা হও।'

আড়ে-দীঘে সমান রীবন্দ্র কাব্যগ্রন্থাবলীর বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে এ হল মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী, যাকে টালি সংস্করণ বলা হয়। বাকিটা তাঁর রবীন্দ্র-প্রতিভার মুগ্ধ হবার কাহিনি।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় অনেক বার এসেছে। তাতে শ্রদ্ধার অভাব কোথাও নেই — স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনদৃষ্টির পার্থক্য। পূর্ণ রবীন্দ্রযুগে প্রথম থেকেই যতীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরণের উৎসৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস — শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চেতনালোক এবং বাকনির্মিতি দুটিই প্রবল মৌলিকতায় আমাদের বিস্মিত করে। খুবই আশ্চর্য সমাপতন যে ১৮৮৭ সালে তাঁর জন্ম — ঐ বছরই বাংলা সাহিত্যের আরেকজন অনন্য প্রতিভাশালী কবির জন্ম, তিনি সুকুমার রায়। এই দুই কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অমিলই বেশি কিন্তু কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। দুজনেই শেষ উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের দস্তুর বিশ্বকে দেখেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং স্বাধীনতাও দেখেছেন। দুজনেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগতের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য' দুজনের মধ্যেই লক্ষণীয়। জগতকে একটি বিশেষ যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে দেখার চর্চা দুজনেরই ছিল। দুজনেরই তীব্র মৌলিকতার স্বাতন্ত্র্যবলয় ছিল। বাঙালির ভাববিলাসিতাকে দুজেনই দেখেছেন সমালোচকের দৃষ্টিতে, সুকুমার রায়ের কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক পঙ্ক্তি মনে পড়ে যাচ্ছে,

''ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপসিয়া — ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড় —
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও, গাছের থেকে পড়।''

দুজনেরই বিশ্ববিধান সম্বন্ধে একটা সংশয়বোধ আছে। বন্ধু প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশকে ২৩ আগস্ট ১৯২০ সালে লেখা চিঠিতে সুকুমার রায় জানাচ্ছেন, 'আশার কথা, আনন্দের কথা, Optimism-এর কথা, এক বর্ণও সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি না। বারবার করে বলি, খুব বেশি করে বলি এই জন্য যে, বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে আছে, আসলে মনে মনে যা বিশ্বাস করি তা ঠিক উল্টো — rempant, morbid out and out pessimism.

যতীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে

'জগৎ একটা হেঁয়ালি —
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি।
....
চাহিনা প্যাঁচাল যুক্তি —
অদৃষ্ট সাথে উপায়হীনের নিত্যনূতন চুক্তি।'

কিন্তু চিত্তের গভীরে নিহিত বিষাদ দুই কবিকেই কখনো জীবন বিমুখ করেনি। সুকুমারের অস্ত্র হয়েছে ননসেন্স,

যন্তীন্দ্রনাথ তাঁর দুঃখবাদের দর্শন তুলে ধরেছেন। 'অনুপূর্বা'র ভূমিকায় মহাদেব সরকার খুব তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন, 'যতীন্দ্রনাথ জ্ঞানপন্থী, তাই তাঁর অভিমান কখনও বীর্যহীন নয়, তার আক্ষেপ কখনো সমাধান-পরাঙ্মুখ নয়, তাঁর বিদ্রোহ কখনও ধ্বংসাত্মক নয়, তাঁর শ্লেষ কখনও অসংস্কারমুখী নয়। যতীন্দ্রনাথ ভীরু, পলাতক, আশাভঙ্গ, পরাজিত স্থবিরচিত্ত নন। সজাগবুদ্ধি ও ঋজু মেরুদন্ড নিয়েই জীবনকে — জীবেনর অঙ্গীকার ও পরিহাসকে গ্রহণ করেছেন।'

'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' লিখে বাংলা কাব্যজগতে মরুকবি হিসেবে যিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন, অনেকেরই ধারণা 'সায়ম', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'য় তিনি নিজেকে পরিবর্তিত করেছেন। কিন্তু মৌল বিষাদ বা দুঃখবোধ কিন্তু বদলায়নি। এসেছে একটা শান্ত পরিগ্রহণের ভাব। 'নিশান্তিকা'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথের নিজের মুখে কাব্যরচনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তাঁর কবি হবার আদপেই কোনও অভিপ্রায় ছিলনা। তিনি পাশ করা materialist ইঞ্জিনিয়ার। লোহালক্কড়, ব্রিজ-কালভার্ট এমন সব ভারী কাজের নিরেট জিনিস নিয়েই তাঁর কারবার। সুতরাং সমকালীন কবিদের ভাবালুতার আকাশকুসুমের একঘেয়ে ভাপসা মিষ্টিগন্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠলো। এসব কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে জাগলো বিদ্রোহ। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্যেই তিনি কবিতা রচনায় হাত দিলেন। কিন্তু বাংলার কবিদল তাঁর বিদ্রূপকেই কাব্যজ্ঞানে চেঁচিয়ে উঠলেন — 'কবি-কবি-কবি'।

তিনি যে চিত্রকল্পে, ভাষায়, ছন্দে একেবারে তাজা স্বাদ এনে দিলেন — নিজের পথ নিজেই কেটে নিলেন কারো অনুসরণ না করে — এ সবই প্রমাণ করে তিনি প্রতিভাবান কবি, বাংলার কবিদলের ভুল হয়নি। তাঁর হাতে কলম কখনো কখনো কৌতুকের তরবারি হয়ে উঠল। বিষাদ আর চাপা পরিহাস মিলে তাঁর কবিতা আশ্চর্য দ্যুতিময় মূর্তি ধরল। কীভাবে যতীন্দ্রনাথ নির্মম সত্যকে অনায়াসে কবিতায় তুলে আনতেন 'নিশান্তিকা'র 'খোলা কথা' থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

বিগত যৌবনা নারীর সংলাপ —

'সেই যৌবন মম
সেই প্রেম, প্রিয়তম,
        চলে গেছে তুমি কাঁদো তাই।
আমি যে বেঁচেছি প্রিয়,
        দু'পায়ের ধুলা দিও
তারে আর ফিরিয়া না চাই।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, 'ছন্দে গাঁথা সত্যের ভীষণতায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' একটু মনে করি 'দরিদ্রনারায়ণ' কবিতা, যার কথাবস্তু 'রিফিউজি প্রবলেম' —

'এবার সেবার সুবর্ণযোগ
        ধ্বনিত দিক দিগন্ত,
দ্রাবিড় বেলুড় মাড়োয়ার হতে
        ছুটিছে পুণ্যবন্ত।

যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়,
        পতিতোদ্ধার পরায়ণ —

বাংলায় আর নর মেলা ভার
যা আছে সেরেফ নারায়ণ।'

দাঙ্গা ও দেশভাগের সাক্ষী হতে হয়েছে যতীন্দ্রনাথকে। দেশের পরিস্থিতি স্বভাবতই তাঁকে তীব্র যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করেছে। শিয়ালদা স্টেশনে সব হারানো উদ্বাস্তুদের ঢল সেইসময়ে প্রতিদিনের কাহন। 'নিশান্তিকা'র 'বাঘ-ছাগলের কথা' কবিতাটি মর্মভেদী রাজনৈতিক বিদ্রূপ। রূপকাবৃত করার প্রয়াসে ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছেন 'বনপীরের গান'। আসলে দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত আর জনবিস্ফোরণের অদ্ভুত ছবি। বাঘ এখানে যেন অখন্ড বাংলা।

'রক্তরাঙা গাঙের ধারা ভিজে বালির চর, —
আহা যেন খাঁড়ার দাগ;
এক পারে তার মুন্ড পড়ে আর পারে তার ধড়,
হায় কাটা পড়ল বাঘ।

দক্ষিণরায়ের বরে মুন্ড তবু ছাগল খায়
তার ক্ষুধা নাহি মেটে,
পেট নেই তার পেট ভরে কি ? চালান করে হায়
সব এপারের পেটে।

কাটা মুন্ডের ভয়ে ওপার হয় বা ছাগলহীন,
আর এপারে হাঁসফাঁস,
এপারের সব ছাগলগুলি ভাবছে নিশিদিন
কোথা মিলবে এত ঘাস ?'

বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায় সুকুমার রায়ের সঙ্গেই তাঁর মিল। দুজনের বলার ধরণ আলাদা কিন্তু ভন্ডামি মিথ্যাচার সমাজের নানা ধরণের অসঙ্গতি দুজনেরই লক্ষ্যবস্তু। যতীন্দ্রনাথের আরেক অস্ত্র ছিল প্যারডি। বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের কবিতার। সরকারি ও বেসরকারি কাজে ইঞ্জিনীয়ার যতীন্দ্রনাথকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। তিনি দেখেছেন নানাবিধ দুর্দশায় পীড়িত, ক্ষুৎকাতর, রোগজীর্ণ গ্রামীণ মানুষকে। রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গে শরৎ' কবিতার অমল শ্যামল শোভার উল্টো ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর 'শরতে বঙ্গভূমি' নামে মর্মভেদী প্যারডিতে। বিশ শতকের শেষ ও একুশ শতকে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর বিজয়গৌরবে ফিরে আসা দেখে মনে পড়ে যায় 'পারে না বহিতে লোকে জ্বরভার / পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর' কিংবা 'ভান্ডারদ্বার খুলেছে জননী / বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।'

''খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে;
কুটীরে কুটীরে নব নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে মাতা উঠে ক্রন্দন,
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন,

যমদূতচয় মুঠা মুঠা লয় —
পড়ে পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে।
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে।' (শরতে বঙ্গভূমি)

দুর্নীতি, সরকারি কাজে পুকুরচুরির বৃত্তান্ত, শ্রমজীবী মানুষের অচল অটল দৈন্যের ভবিতব্য — এসব কিছুই কৌতুকরসে মজে উঠে এসেছে প্যারডিতে। রবীন্দ্রনাথের 'যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' — এই গভীর দার্শনিক ভাবনাঋদ্ধ গানটির বিপরীত ছবি ফুটে ওঠে 'চির-চাকরি'তে।

'তখন, এমনি করেই গাঁথবে বাড়ি মিস্তিরি,
ভিতর ফাঁকি বাইরে চুনের ইস্তিরি,
পথের মজুর ভাঙবে পাথর,
চলবে খেটে ছুতোর মেথর,
ঠিকেদারের মিলবে সঠিক দস্তুরি;

সাবলাইমের বিপরীতে রিডিক্যুলাস — রবীন্দ্রনাথের 'নগরলক্ষ্মী'র প্যারডি 'বাড়িভাড়া'। প্যারডির এই ধরণটিতে লুইস ক্যারলের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য আছে। লুইস ক্যারল বিখ্যাত নীতিবচনমূলক কবিতার এমন প্যারডি করতেন, উঠে আসত প্রকৃতির হাঁ করা মুখ, জীবজগতের অনিবার্য খাদ্যখাদক সম্পর্ক।

'থ্রু দ্যা লুকিং গ্লাসে'র ওয়ালরাস কার্পেন্টারের কবিতাটি পাঠকের মনে পড়তে পারে। 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে' আশ্চর্য জগতে পৌঁছবার পর অ্যালিস নিজের স্মৃতিশক্তি ঝালাই করবার জন্য একটি পুরোনো বিখ্যাত নীতিকবিতা মনে করার চেষ্টা করছিল। কর্মনিষ্ঠ মৌমাছির দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থক করার ছবি ছিল তাতে।

'How doth the little busy bee
Improve each shining hour,
And gather honey all the day
From every opening flower.'

কিন্তু কবিতাটি অ্যালিসের মুখ দিয়ে যে চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল তা মোটেই শিশুপাঠ্য, নীতিসুধা বর্ষণকারী ছড়া নয়। তাতে আছে কুমিরের মস্ত বড়ো হাঁ করে ছোটো ছোটো মাছদের গিলে খাবার বর্ণনা। মৌমাছির কর্মব্যস্ততার মতোই জীবজগতের আরেক ভয়ংকর বাস্তব।

'How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pours the waters of the Nile
On every golden scale !

How cheerfully he seems to grin,
How neatly spreads his claws.
And Welcomes little fishes in
With gently shining jaws.'

‘বাঁচা চাই’ ত্রিযামার এমন একটি কবিতা যা ভাবের দিক থেকে সুকুমার রায়ের ‘কাতুকুতু বুড়ো’ মনে পড়িয়ে দেয়। বুদ্ধিদীপ্ত বিষাদকৌতুকে এই দুই কবি সেখানে সগোত্র।

‘হাসি যাদের পাচ্ছে নাকো লাগাও কোঁকে শুড়শুড়ি;
হাসতে পারে ফরমাসে এক কবি, কিম্বা গুড়গুড়ি।
অনটনের টানে টানে
ধোঁয়া হয়ে উঠছে মানে,
মাথায় যখন টিকের আগুন পেটে হাসির ভুরভুরি।’

৩.

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নিজেকে রোমান্টিকতা বিরোধী হিসেবেই প্রচার করেছেন। সে সব কবিতা বিখ্যাত — পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসলে তিনি রোমান্টিক ভাবলুতা বিরোধী। এই প্রযুক্তিবিদ কবির চিত্রকল্পগুলি আমাদের সামনে মেলে ধরে এমন এক জগৎ যা হয়তো প্রচলিত অর্থে রোমান্টিক নয় কিন্তু গূঢ় ভাবে রোমান্টিক, বাস্তবকে যা অনেক সময় পরাবাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, শব্দে সেই আশ্চর্য আভা আনে যা শুদ্ধ কবিতার আত্মা। এই সব ইমেজারি উপমার মৌলিকতায়, সুন্দর ও অসুন্দরকে আত্মস্থ করা ব্যাপ্ত জীবনবোধে এবং যথার্থ শব্দ নির্বাচনের দাপটে আমাদের এখনো আমূল চমকে দেয়।

‘‘কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা —
সদ্যছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুন্ডের মালা।’’
(ঘুমের ঘোরে)

কালিকামূর্তির মিথ কী অদ্ভুত রূপান্তর পেয়েছে এই ছবিতে। ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদ করেছিলেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ। বিখ্যাত সেই অনুবাদের অনেক পঙ্‌ক্তি। আপাতত দুটি লাইনে চোখ রাখছি,

‘‘বিধি বিধানের শীত পরিধান ফাগুন আগুনে দহন করো,
আয়ু বিহঙ্গ উড়ে চলে যায়, হে সাকী পেয়ালা অধরে ধরো।’’

যতীন্দ্রনাথ এই প্রমোদপ্রিয় জীবনোল্লাসকে উল্টে দেন দেহভয়ের বাস্তবতায়,

‘‘উড়ে যায় আয়ু কালের আকাশে — ডানায় শব্দ নাই,
খসে পড়ে বুঝি দেহের পালক, সে ভয়, সর্বদাই।’’

খুব অবাক লাগে ‘মরীচিকা’ কাব্যগ্রন্থের ‘ডাক-হরকরা’ কবিতাটি কীভাবে আমরা ভুলে রইলাম। একই বিষয় নিয়ে লেখা সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের ‘রানার’ আজ কিংবদন্তী। ‘মরীচিকা’তে ১৩১৭-১৩২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা কবিতাগুচ্ছ আছে। দেখা যাচ্ছে সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের অনেক আগেই এই বিষয়টি যতীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল।

‘‘বধূ, তুমি ভাবিতেছ ‘ঝম্ ঝম্ ঝম্ —
কে যায়রে
কার অভিসারে?

কোথা যাই ? থাক চিন্তা, ওই উষা রাঙাইছে আঁখি
পূর্বাশার দ্বারে।
যে বোঝা বহিয়া আনি, শুনিয়াছি আছে এর মাঝে
নূতন বারতা;
কত বিরহের শান্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন —
মিলনের কথা !

....

কে জানে কাহার বোঝা কেন সর্ব বিপদ হইতে
প্রাণ দিয়া রাখি !
দুর্দিনের বৃষ্টি ধারে নিজ শির হতে ছত্র লয়ে
কেন তারে ঢাকি ?”
(ডাক-হরকরা)

৪.

প্রথম যখন কলেজ জীবনে ‘অনুপূর্বা’ হাতে পেয়েছিলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সজীব অভিনব চিত্রকল্পগুলি মুগ্ধ করে ফেলেছিল। তেমন কয়েকটি বাক্‌প্রতিমা সাজিয়ে দেওয়া গেল।

বেলা পড়ে আসে বধূ চলে ঘাটে
ভরিতে সাঁঝের জল।
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল
চ্যুত ছায়া অঞ্চল।
(নব নিদাঘ)

মায়ার অতীত অয়ি মায়াবিনী,
কতই না রূপ ধর,
যৌবনখানি বসনের মত
খুলে রাখ খুলে পর।
(বার নারী)

বেতসের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি —
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি।

ভালো লেগেছিল ‘পথের চাকরি’ — মঙ্গলকাব্যের বারোমাস্যার এক সাইকেলী ভাষ্য। গ্রামের জীবন, শ্রমজীবী মানুষকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখার চোখ ছিল তাঁর। যে চোখ ছিল বলে তিনি সাঁড়াশি আর ছেনির ক্লান্ত প্রেম দেখতে পেয়েছিলেন। বহুবার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয়েও দ্যুতি হারায়না সেই সব পংক্তি, এমনি তার জীবনীশক্তি,

"ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে।"

বুদ্ধদেব বসু চমকিত হয়েছিলেন যে আশ্চর্য ছবিটিতে, তার পরের পঙ্‌ক্তিগুলিও কিন্তু ভোলা যায় না। জীবনের নিষ্ঠুর অথচ তীব্র আকর্ষণ, প্রকৃতির প্রসারিত রূপশ্রীর আড়ালে ভয়াল ব্যাদান তাতে অবারিত হয়,

"বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা —
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।
খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়ঋতু ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য।"

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন মিল ও ছন্দের রাজা। সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রতিভা আলোচিত কিন্তু দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মজায় দুলিয়ে দেওয়ার দিকটা আমরা ভুলে থাকি।

'বন্ধু, বন্ধুগো
ভালো চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশি নাহিত সন্দেহ।"

কীভাবে 'গো'র সঙ্গে 'হ' মিলিয়ে দিচ্ছেন কবি দারুণ নৈপুণ্যে। 'রেলঘুম' কবিতায় দেখি ধ্বন্যাত্মক শব্দের চকমকি, রেলের গতির বাজনা, রেলের ঝঞ্ঝনা যন্ত্রবিদের কানে এবং কলমে।

"টং টং — ভোঁ-ভস্
টু-ডাউন ছাড়ে, ব্যস!
ভস্ ভস্ চক্কোর,
চলে যায় টক্কোর।
ঘ্যেস্ ঘ্যেস্ ঘ্যেস্ ঘ্যেস্;
গদিটায় দিই ঠেস।
★★★★★★
ঘস্-গড় গুড়ু গুম,
গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম,
বর্ষার মরসুম
নদীজলে বড় ধুম।"

এমন কবিতা তাঁর আরো অনেক রয়েছে, প্রবন্ধ দীর্ঘ হবার ভয়ে ক্ষান্ত দিচ্ছি।

'ফেমিন রিলিফে'র মতো কবিতায় দুর্দান্ত ছবি, ছন্দ আর মিলের তালবাদ্যে শব্দের খেলায় অন্নদা শঙ্কারের ছড়া মনে করিয়ে দেয়।

'দফাদার মামাগো।
মাটি না এ ঝামা গো?
....

দাঁড়িয়ে যে বাদলা ?
ছেলেটা ? বালাই গেছে, তুই ভাই কোদলা।
এই ছোঁড়া সুখলাল
কোন দুখে মুখ লাল ?
....
ওই মোলো ছুড়িটা, —
ছুঁড়িটা না বুড়িটা ?
নাহক হুঁচুটে পড়ে ভাঙে নয়া ঝুড়িটা।'

বাংলা কবিতায় পাঠকের কাছে কেয়াফুলের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কবিতা যেন অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে। যেন এক আত্মঘাতী নারীমূর্তি ধরেছে একগুচ্ছ কেয়াফুল 'কেতকী' কবিতায়। বৌবাজারের মোড়ে কসাইয়ের দোকানের পাশেই ফুলের বেসাতি — এই বিপ্রতীপতা সে কবির চোখে পড়ে তিনিও প্রথমে যেন নববর্ষার কেয়ার রূপ ও সুবাসে মুগ্ধ। 'শ্যাম পাতে ঢাকা শ্বেত কিশলয়, তাহে ঢাকা পীতরেণু' — শয়ন কক্ষের দেয়ালে হুকে ঝুলন্ত সেই ফুল ঘরের বাতাসকে মদির মন্থর করে দেয়। কিন্তু মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে কী দেখলেন কবি,

'আধ ঘুমে চাহি দেখিনু চমকি..... ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি।
কষিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা !
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য, ... দেখিলাম প্রাণবন্ধো।
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে মৃত কেতকীর গন্ধ।'

এই কবিতায় কবির কলম যেন এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীর তুলি। জীবনের পাশে জেগে থাকা মৃত্যুর, আত্মহত্যার ছমছমে ছায়া পাঠককে ঘিরে ধরে, বিষাদমগ্ন করে দেয় অনিবার্য ভাবে। 'রূপ কোথা আছে' কবিতাটিতে শারদীয় সপ্তমীরাত্রির বর্ণনা কী আশ্চর্য মৌলিক

''আকাশের পেটিকা খুলিয়া
রঙ চটা বুটি-ওঠা জীর্ণ নীল মাটি
সাবধানে আঁটি অঙ্গে
চলিয়াছে প্রৌঢ়া রাত্রি প্রতিমা দর্শনে।''

'দ্রৌপদীর শাড়ি সম সচন্দ্র যামিনী' আমরা দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় পেয়েছিলাম। কিন্তু রাত্রিকে এমন জরতী রূপে দেখা একান্ত অভিনব। নক্ষত্রগুলি ঈষৎ মেঘম্লান আকাশে যেন পুরাতন রংচটা বুটি জীর্ণ নীল শাড়ির জমিনে। এই কবির কাব্যজগতে প্রবেশের ভাব ও ভাষার সতেজ অভিনবত্ব।

'ত্রিযামা'র 'বনপ্রস্থ' কবিতায় মাতিয়ে তোলা ছন্দোমিল আর চিত্রকল্প তো বিখ্যাত। তবু আরেকবার মনে করি সেই ছবিতে সুরেতে নিখুঁত ভারসাম্য, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন কবিতার চিত্র ও সংগীত।

'দুর্যোগময় রাত্রিযাপন
নির্জন বন বাংলায়;
নিম্নে পাহাড়ি নামহারা নদী
বাঁকে বাঁকে টাল সামলায়।
জল কেন হোথা ছলকায় ?
বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায় ?
সুদূরে তরুণী গারোনীর ডাকে
পথহারা গাভী হামলায়।'

যদিও এই উচ্ছল বনস্বপ্ন তিনি ভেঙে দিয়েছেন চূড়ান্ত নাটকীয় মাত্রা এনে, 'কল্য প্রভাত ভরিয়া উঠিবে আমলায় আর মামলায়।'

'রবীন্দ্রবিরোধী' বিশেষণ যাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাঁর 'বাইশে শ্রবণ ১৩৪৮' কবিতাটির ধিক্কার হয়তো আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। জোড়াসাঁকো থেকে কবির মরদেহ নিয়ে শেষযাত্রায় যে অশালীন, চূড়ান্ত অসম্মানজনক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়েছিল তা গোটা বাঙালি জাতির চিরকালের কলঙ্ক হয়ে আছে। মর্মাহত যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার আভাস দিয়ে যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন।

"দূর হতে কানে আসছে —
বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি !
সহসা দেখা গেল —
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ !
মনে হল —
কি বিচিত্র শোভা তোমার —
কি বিচিত্র সাজ !
জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া জোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হয়ে
টানছে সেই যান।
টলছে যত তাদের পা,
দুলছে তত রথের বিজয়কেতু !"

ভক্তিমদমত্ত জনতার এই ভয়াবহ নিয়ন্ত্রণহীন আবেগের ছবিতে যেভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনার টুকরো বা ভঙ্গিকে ব্যবহার করা হয়েছে তা সমর সেনকে মনে পড়ায়। সেই সঙ্গে আমরা এটাও লক্ষ করি শেষদিকে তাঁর কবিতা গদ্যছন্দের দিকে বাঁক নিচ্ছিল।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কল্লোলের কবি নন। কিন্তু তাঁর কবিতায় নির্ভুল ভাবে বাংলা কবিতার আধুনিক যুগ-যন্ত্রণাকে অনেকখানি চেনা যায়। তিনি তাঁর টালমাটাল পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন, উনিশ শতকীয় মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের ক্রম বিধ্বস্ত চেহারা তিনি উপলব্ধি করেছেন। চারপাশে সেইসব বিচূর্ণ মিনারের চূড়ার মধ্যে বসে তিনি অস্তিত্বের অর্থ সন্ধান করেছেন। স্বভাবতই তাঁর কবিতায় প্রধান হয়েছে আশাহত হৃদয়যন্ত্রণা, যা কোনোদিন প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না।

'স্বস্তি ধনিক ধন   স্বস্তি বণিকজন
স্বস্তি হাতুড়ি আর কাস্তে,
স্বস্তি সাঁড়াশি লেদ্   স্বস্তি যন্ত্রবেদ
করাত-কাটে যা যেতে আসতে।
ছোট বড় যান্ত্রিক   যে তন্ত্রে তান্ত্রিক
সবাই হউক শবসিদ্ধ।
স্বস্তি কর্মশাল   স্বস্তি নগরপাল,
স্বস্তি বিমূঢ় কৃতবিদ্য ।"

(লৌহনগরী)

কিন্তু যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য কখনোই দিগ্‌ভ্রান্ত কোনো উৎকেন্দ্রিকতায় পৌঁছয়না, তাঁর কবিতার আরাধ্য দেবতা শঙ্কর। যিনি ভাঙনের দেবতা, আবার সৃজনের দেবতা। নটরাজের লীলা তাঁর কবিতায় কখনো আমাদের শিবায়নের গেঁয়ো শিবের গাজনের নাচে ধরা দিয়েছে। সমস্ত অসংগতি যেন সেই তান্ডব তালে গিয়ে সম পায়। 'ত্রিযামা'র 'ভাঙাগড়া' কবিতাটি দিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাই। বিদ্যাপতি শিবকে সংসারে অভাব দূর করার জন্য 'কিরিষে' মন দিতে বলেছিলেন। ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙলের ফাল নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী ও ঐতিহ্যময় কাব্যের সঙ্গে তাঁর আধুনিক জীবনসংকট আর বিপন্নতাকে মিলিয়ে এক নবপুরাণকল্প রচনা করেছেন — দেখিয়েছেন উত্তরণে পথ। কঠিন পরিশ্রমে জীবনের ভূমিকে সুফলা করার স্বপ্ন দেখেছেন। মানবতার পরাজয়ে তিনি বিশ্বাস করেননি।

'মেঘে মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয় শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।
শঙ্কর ! হও সঙ্কর্ষণ
মাঠি ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা।

★★★★★★

দেবতা যখন পূজা পেয়ে পেয়ে হল দানবের বাড়া,
শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব তবে ভাই পাবে ছাড়া।।'

(ভাঙাগড়া)

(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলা আকাদেমি রবীন্দ্র ও কাকুরা ভবনে পঠিত।)

মাসাদা/এক বীরগাথা

ড. বীথি সরকার, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ

ইস্রায়েল গেছিলাম ২০১৩-তে। মধ্য এশিয়ার এই রাজ্যটির সাথে জড়িয়ে আছে তিন হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস। উপরন্তু ইস্রায়েলকে বলা হয় 'পবিত্র ভূমি' (The Holy Land) — পৃথিবীর তিন তিনটি প্রধান ধর্ম্মের (ইহুদী ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম্মের) সাথে এ জায়গার নিবিড় যোগাযোগ। ১৯৪৮ সাল থেকে ইস্রায়েল স্বীকৃতি পেয়েছে 'ইহুদী রাষ্ট্র' হিসাবে। ইতিহাসে আগ্রহী যে কোনও ভ্রমণ পিপাসুর কাছে জায়গাটা তাই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কিন্তু ইস্রায়েল দেখতে এসে এমন এক আশ্চর্য ইতিহাস সমৃদ্ধ কাহিনীর সন্ধান পাব ঘুণাক্ষরেও সেটা ভাবিনি। সে কথাই বলব।

যেরুসালেম থেকে একশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মরুভূমির মধ্যে এক হাজার ফিট উঁচুতে এক পাহাড়ী দূর্গ — নাম মাসাদা।[১] বিখ্যাত লবণ হ্রদের (Dead Sea) পশ্চিম পাড়ে। রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে। পাহাড়ের উপরের অংশটা সমতল। পূর্ব আর পশ্চিম দিকে নেমে এসেছে খাড়া পাহাড়। মাসাদা আমদের গন্তব্যস্থল। উপরে ওঠার জন্য দুটি ব্যবস্থা — প্রথমটা 'চলন্ত গাড়ীতে' (Cable Car) — দু-তিন মিনিট উপরে ওঠা যায় — এখানে বেশ ভীড়। অন্য পথটি পাহাড় ঘিরে এক সর্পিল পায়ে চলার পথে — ঘন্টা খানেক সময় লাগে উঠতে। ইতস্তত অল্প কিছু লোক চোখে পড়লো সে পথে। শুনলাম খৃষ্টপূর্ব ৩৭-৩১ সালে (37-31 BC) ইস্রায়েলের রাজা হেরোদ এ দুর্গের কাজ শেষ করেছিলেন। ইস্রায়েল তখন ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীনে। রাজা হেরোদ ছিলেন রোম সম্রাটের প্রতিনিধি — এক অত্যাচারী রাজা। সম্ভবত প্রজা বিদ্রোহের ভয়ে লোকালয় থেকে দূরে এই দূর্গ পত্তন করেছিলেন। এটা ছিল তার প্রাসাদও। প্রসঙ্গত আমরা যা যা দেখলাম সবই ১৯৬৩-৬৫-তে ইস্রায়েলের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যের ফলশ্রুতি।[২]

পাহাড়ের ওপরের সমতল ভূমির চারদিক ঘেরা রয়েছে চওড়া দেওয়াল দিয়ে। মাঝে মাঝে ভার বহন করবার জন্য খিলান ও অস্ত্র রাখার জন্য ঘর। একটা পাথরে খোদাই করা দুর্গের ম্যাপও চোখে পড়লো। পাহাড়ের উত্তর দিকে নেমেছে পরপর তিনটি ধাপ। সেখানেই সমস্ত নির্মাণের কাজ (3-tier palace) সবচেয়ে নীচের ধাপে সমান দূরত্বে আছে সারি সারি থাম, দেওয়ালে ফ্রেসকো পেইন্টিং। মাঝের ধাপে গোলাকার রাস্তা, কারুকার্য করা থাম ও দেওয়ালে পেইন্টিং। সবচেয়ে উপরের ধাপে রয়েছে আসল প্রাসাদ, শয়নকক্ষ, স্নানাগার, খাদ্য সংগ্রহশালা, অস্ত্রাগার। বিশেষ লক্ষণীয় পাহাড়ের গায়ে খনন করা এক বিরাট কুন্ড — বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য। সবটা ঘুরে দেখতে ঘন্টাখানেকের বেশীই লাগলো। মরুভূমির মধ্যে এরকম স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ২০০১ সালে মাসাদা দূর্গ এর প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষত্বর জন্য Unesco World Heritage Site-এর মর্যাদা পেয়েছে। প্রতিবছর ৭,৫০,০০০ জন পর্য্যটকের আগমন হয় এখানে। এই পর্য্যন্ত ঠিকই ছিল, অন্যান্য যে কোন ঐতিহাসিক জায়গা দেখলে যেরকম রোমাঞ্চিত হই সেরকম। কিন্তু চমকৃত হলাম যখন শুনলাম এর সাথে জড়িয়ে আছে এক করুণ-বীরত্বের কাহিনী। জানতে আগ্রহ হল সেলস্ কাউন্টার থেকে বই-ও জোগাড় হলো প্রাথমিক ভাবে।

এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে ইতিহাসবিদ তাঁর নমে যোসেফাস ফ্লেবিয়াস (Josephus Flarius - 37AD-100Ad)।[৩] জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইহুদী — পরে ঘটনাচক্রে রোমানদের সঙ্গে যোগ দেন, নিজের নামও পরিবর্ত্তন করেন। তার লেখা Jewish War বইতে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইস্রায়েল দীর্ঘদিন ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। যীশুখৃষ্টের জন্ম-মৃত্যুর

(21 BC-30 AD) সময়েও তাই ছিল। ফ্লেবিয়াস লিখেছেন, অবশেষে 66 AD-তে ইস্রায়েলীরা বিদ্রোহ করে রোমের বিরুদ্ধে (Jewish-Roman Revolt : 66AD - 72 AD) শক্তিশালী রোমান সৈন্য সহজেই সে বিদ্রোহ দমন করে। যেরুসালেমের বিখ্যাত মন্দির ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, সহস্রাধিক ইহুদী হয় মারা পড়ে, নয় বন্দী হয়। সেইসময় একদল চরমপন্থী ইহুদী বিদ্রোহীরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় এই মাসাদা দূর্গে। তাদের গুরু ছিলেন এলিজর বেন ইয়ার (Eleazer Ben Y'r) এদের সাথে যোগ দেয় যেরুসালেম থেকে বিতারিত আরও কিছুজন। যোসেফাসের মতে সবাই মিলে (স্ত্রী-পুত্র মিলিয়ে) মোট ৯৩০ জন। পাঁচ-ছ বছর তারা সবাই এই দূর্গে লুকিয়ে ছিল। জল বা খাবার সংস্থানের অভাব ছিল না। বিরাট জলাধারে সংরক্ষিত ছিল জল, খাদ্যাগারে শস্যসমগ্রী। বিদ্রোহের ছ'বছর পর (72 AD) রোমান গভর্নর লুসিয়াস ফ্লেবিয়াস সিলভা-র (Lucius Flavius Silva) কাছে সে খবর পৌঁছালো। তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে (আনুমানিক ১৫,০০০ জন) মাসাদার দূর্গ অবরোধ করেন। প্রথমেই দূর্গ ঘিরে নির্মাণ করেন এক সুউচ্চ প্রাচীর বিদ্রোহীদের পালানোর পথ বন্ধ করে। এরপর পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে তৈরী করতে থাকেন এক ঢালু পথ (ramp) নীচ থেকে উপর পর্যন্ত। একশ ফিট উঁচু এই পথ তৈরী করতে তাদের সময় লেগেছিল দু থেকে তিন মাস। ফ্লেবিয়াস তখন ছিলেন রোমান সৈন্যদের সঙ্গে, পর্যবেক্ষকের ভূমিকায়।

ইতিমধ্যে মাসাদা বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ বুঝতে পারছিল যে তাদের পালাবার আর কোনও জায়গা নেই। প্রতিদিন তারা একত্র হয়ে তাদের আরাধ্য ঈশ্বরকে স্মরণ করত। প্রতীক্ষা করত কোনও অলৌকিক ঘটনার জন্য। কিন্তু যতই রোমান সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র-গোলাগুলি সমেত র‍্যাম্প বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো ওরা ওদের নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পেল। শেষ সময়ে গুরু এলিজর বিদ্রোহীদের সাহস জোগানোর জন্য দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ফ্লাবিয়াস তাঁর বই-এর এর সারাংশ তুলে ধরেছেন । তিনি বলেছিলেন — ''বহুদিন আগে আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে আমাদের ঈশ্বর যিহোবা, ছাড়া কারও কাছে আমরা নতজানু হব না। যিহোবাই আমাদের একমাত্র প্রভু। আজ সময় এসেছে সে শপথ রক্ষা করার। আমরাই প্রথম যারা প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছিলাম এবং ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন আমরাই হব শেষ বিদ্রোহী। আত্ম সমর্পণের আগে আমরা মৃত্যুবরণ করব।'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনভাবে স্বইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করার সুযোগ দিয়েছেন। অতর্কিতে যারা আক্রান্ত হয়, তারা সে সুযোগ পায় না। আমরা পেয়েছি। আজ আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আর কয়েক দিনের মধ্যে রোমানদের হাতে হবে আমাদের ভয়ঙ্কর পরিণতি — মৃত্যু নয় দাসত্ব। কোনোটাই আমাদের কাম্য নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা বেছে নি এক গৌরবজনক শেষ — স্বেচ্ছামৃত্যু''। গুরুর কথায় তারা সেই পথই বেছে নিয়েছিল।

(ফ্লেবিয়াস লিখেছেন দুজন ইহুদী মহিলা তাদের সন্তানদের নিয়ে জলাধারের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করেছিল। ফ্লেবিয়াস তাদের কাছ থেকেই বিশদ সব খবর পেয়েছিলেন।)

খুব সকালে রোমান সৈন্যরা জয়ের উল্লাস নিয়ে যখন র‍্যাম্পের শেষ ধাপে পাহাড়ের উপরের সমতলে এসে পৌঁছালো — তারা দেখল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য — সারি সারি মৃতদেহের এক সমাধিক্ষেত্র (A Citadel of Death)। রোমানরা জয়ী হলো বটে কিন্তু এটা কি ধরণের জয়? বস্তুতঃ এটা ছিল এক নৈতিক পরাজয়, মানসিক (Psychic) পরাজয়। ফ্লেবিয়াসের কাহিনীর এখানেই শেষ।

কিন্তু এখানে কাহিনীর শেষ নয়। ফ্লেবিয়াসের বই-এর মাধ্যমে সে ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সেটা পুরুষানুক্রমে যে কি পরিমাণ আলোড়ন তুলেছিল তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায় — কবিতার নাটকে, গল্পে, গানে, এমনকি সিনেমায়। তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এ ঘটনা প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিল।

১৯২৬শে ইহুদী কবি আইজাক ল্যামডেন (Isaac Lamden, 1899-1954) মাসাদার কাহিনী অবলম্বন করে কবিতা লেখেন।[৪] নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে যে একদল ইহুদী বিদ্রোহী অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি শপথ নিয়েছিলেন — "মাসাদার পতন আর কোনদিন হবে না" (Masada shall not fall again)। বিংশ শতাব্দীতে সে শপথ হয়ে উঠেছিল ইস্রায়েলী সৈন্যদের রণ হুঙ্কার। এমনকি পরবর্ত্তী কয়েক দশক ধরে নবনিযুক্ত ইস্রায়েল সৈন্যরা শপথ গ্রহণ করত এই মাসাদায়। এটা যে শুধু তাদের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করত তাই নয়, তাদের মনে সাহস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করত। পাহাড়ের উপরে আগুনের চারিদিকে দাঁড়িয়ে পাঠ করা হত ল্যামডেনের কবিতা এবং ফ্লেবিয়াসের বই-এর কিছু অংশবিশেষ। বিয়োগান্তক নাটকের মতো তার রেশ ছড়িয়ে পড়ত — সবার কণ্ঠে শোনা যেতো সেই স্লোগান — "মাসাদার পতন আর কোনদিন হবে না" অথবা "গুরু বেন ইয়েরোর মৃত্যু নেই, উনি আবার ফিরে আসবেন"। এই কবিতা হাজার ইস্রায়েলীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু কবি নিজে কখনও মাসাদায় যান নি। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে (১৯৫৪) তিনি আত্মহনন করেন। ঘটনাটা আশ্চর্য্যজনক — কারণ ইস্রায়েল তখন স্বাধীন রাষ্ট্র। কোন স্বপ্নভঙ্গে তিনি এ কাজ করেছিলেন?

১৯৫১-তে স্বাধীনতার পরে পরে কানাডার সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ জন ওয়েনজউইগ[৫] (John Weinzweig) ল্যামডেনের কবিতায় সুরারোপ করেন। সুরের মুর্ছনায় সে কবিতা একটি নতুন রূপ পেল। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল সে গান — মাসাদার নাচ (Dance of Masada)। পরবর্ত্তীকালে ১৯৯৭ সালে কানাডার ইহুদী কমিশন স্থির করলো এই গানকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পরিবেশিত হয় (Orchestration)। ১৯৯৮-এ সাফল্যের সঙ্গে সেটা মঞ্চস্থ হয়। এখনও সামাজিক মাধ্যমে এ সঙ্গীতের খোঁজ পাওয়া যায়।

১৯৮১-তে মুক্তি পেলো 'মাসাদা' নামে সেই বিখ্যাত আমেরিকান টেলিভিসন সিরিজ। ১৯৭১-এ প্রকাশিত একই নামের এক উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে[৬]। স্বনামধন্য অভিনেতা পিটার ওটুল (Peter O'tool) এবং পিটার স্ট্রাউস (Peter Strauss) যথাক্রমে অভিনয় করেছিলেন রোমান জেনারেল এবং ইহুদী গুরুর। সেটা দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। অভাবনীয় সিনেমাটোগ্রাফী ও অভিনয় পুরো ঘটনাকে জীবন্ত করে তুলেছিল।

অসংখ্য কাহিনী উপন্যাস ইতিহাস লেখা হয়েছে মাসাদার ওপর। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

ইহুদী ইতিহাসবিদ এবং লেখিকা ক্লারা পালটাই[৭] (Klara Paltai) ২০০২ সালে লিখেছিলেন "মাসাদার এই ঘটনা ইস্রায়েলকে তার জাতীয় পরিচয় খুঁজে পেতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। মাসাদার যোদ্ধারা যে সাহস দেখিয়েছিল তা অভূতপূর্ব — প্রায় তিন বছর মাসাদার দূর্গকে রক্ষা করতে পেরেছিল তারা এবং শেষে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিল, শক্তিশালী স্বেচ্ছাচারী রোমান শত্রু বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। এ স্থান নিঃসন্দেহে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী স্থান হওয়া উচিত।" তিনি আরও লিখেছেন — মাসাদাতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্য চালানোর জন্য যখন স্বেচ্ছাসেবক চাওয়া হয়েছিল তখন এত আবেদনপত্র জমা পড়েছিল — সেটা নিছক কাজে উৎসাহ নয়, মাসাদার সাথে তাদের গড়ে উঠেছিল এক ভালবাসার সম্পর্ক। আরও কিছু জনপ্রিয় সাম্প্রতিক উপন্যাসের কথা বলতে হয়। কসটা কাফারাকিস[৮] (Kosta Kafarakis) (২০১৫), জোডি লেনের (Jodie Lane)[৯] (২০১৫) লেখা একই নামের উপন্যাস 'মাসাদার অবরোধ' (The Seige of Masada)। অর্থাৎ কাহিনীর নাটকীয়তা আজও বর্তমান।

এখানে শেষ হলে ভালো হত। কিন্তু না, বিংশ শতাব্দীর শেষে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কিছু ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে এবং এর সুদুরপ্রসারী প্রভাবের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। প্রথমতঃ ১৯৬৩-৬৫-তে বা তার পরবর্ত্তীকালে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ হয়েছিল এ অঞ্চলে, তা পুনর্বিবেচনা করে ফ্রারিয়াসের

লেখার সাথে অনেক অমিল পাওয়া যায়। চত্তরের দেওয়ালের মাপের, প্রাসাদের বর্ণনায়, অনেক অতিরঞ্জন চোখে পড়ে। বিশেষ ছড়ানো মনুষ্য কঙ্কালের সংখ্যা কোনও মতেই ৯০০-র কাছাকাছি হয় না। দ্বিতীয়তঃ ফ্লেবিয়াসই হচ্ছেন এ কাহিনীর একমাত্র লেখক, দ্বিতীয় কোনও লেখা পাওয়া যায় নি। তিনি জন্মসূত্রে ইহুদী হয়েও রোমানদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন তাই কিছু অপরাধবোধ থেকেও এই ইহুদী বিদ্রোহীদের আত্মদানকে বড় করে দেখিয়েছেন।(Jody Magnes - 2020)[১০]।

ইহুদী সমাজ বিজ্ঞানী নাচম্যান বেন ইহুদা[১১] (Nachman Ben Yehuda, 1995) অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে মাসাদা দীর্ঘকাল ধরে ইস্রায়েলের আদর্শের প্রতীক, স্বাধীনতাকামী ইহুদীদের এবং ইস্রায়েলী সৈন্যদের পূজ্য স্থল, উপন্যাস লেখার এবং মুভী তৈরীর উপাদান এবং পর্য্যটকদের স্বর্গে পরিণত হয়েছিল। তাঁর মতে ফ্লাবিয়াসর লেখায় বর্ণিত এই অবিশ্বাস্য অপ্রমাণিত কাহিনী এক বীরত্বের পুরাকাহিনীতে পরিণত হয় অনেকগুলো সামাজিক শক্তির সম্মিলিত ও বাঞ্ছিত প্রচেষ্টায়। সে শক্তিগুলোর উল্লেখও করেছেন তিনি। স্বাধীনতা পূর্বের বিপ্লবী সংগঠন, ইস্রায়েলী সৈন্য, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, গণমাধ্যম, যুব আন্দোলন, শিল্পকলা বিভাগ ও পর্য্যটক বিভাগ। মনের করুন, নিঃস্তব্ধ রাতে মরুভূমির মধ্যে পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল পথে একদল মানুষ চলেছে — উপরে আগুনের ধারে উচ্চারিত হচ্ছে ল্যামডেনে কবিতা, পড়া হচ্ছে ফ্লাবিয়াসের কাহিনী — সে পরিবেশে যুদ্ধে পরাজিত একদল ইস্রায়েলী সৈন্যের রহস্যময় আত্মহননের কাহিনী এক নিমেষে বীরগাথায় নবরূপ পায়।

পরিশেষে বলা যায়, এ কাহিনী পুরোপুরি সত্য হোক বা না হোক এটা অস্বীকার করা যায় না যে এর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে লুকানো আছে ইহুদী সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও আদর্শ।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Fodor's ISRAEL (Travel Guide) 6th edition, 2006.

২। Yigael Yadob, 1973 Masada (Herod's Fortress and the Zealot's last stand), Published by Caroninal.

৩। Flavius Josephus, https://www.encyclopedia.com/people/history/historians-ancient-biographies/flavius-josephus

৪। Yitzhak Lamden (1899-1954), https://en.m.wikipedia.org>wiki

৫। John Weinzweig (1951), Dance of Masada, https://www.johnweinzweig.com>da.

৬। Ernest Gann (1971), The Antagonists, https://en.m.wikipedia.org

৭। Klara Palotai (2002), https:www.linked in.com>klara-pa.

৮। Korta Kafarakis (2015), The seize of Masada : A Historical drama of the famous battle between the Jews and Romans. https://www.goodreads.com>show

৯। Jodiye Lane (2015) The seize of Masada (Turning Point), https://www.amazon.com>seize m.

১০। Jodi Magness (2019) Masada : From Jewish Revolt to modern Myth.https://www.amazon.in>masada-je

১১। Nachman Ben-Yehuda (1995). The Masada Myth : Collective Memory And Myth makinghttps://uwpress.wisc.edu>books

পল্লিপুনর্গঠনে রবীন্দ্রভাবনা ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ড. শ্রাবণী পাল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৯৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নদীপথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জমিদারি কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য যাবার সময় বাংলাদেশের গ্রামজীবনের অসহায় এক ছবি রূপ নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ঃ

> যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়। পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেট-মোটা সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলায় ঠান্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায় — তখন সে দৃশ্য কোনমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরেছে, পা ফুলেছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর ধরেছে — পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না — এত অবহেলা অস্বাস্থ্য দারিদ্র্য মানুষের আবাসস্থলে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়! প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যেসকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।

(ছিন্নপত্র, চিঠি নং ১২১, বিশ্বভারতী, ১৪১১)

এদের দেখেই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা — সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
> বড়ই দরিদ্র, শূন্যে, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।
> সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।
> ..... কবি তবে উঠে এসো — যদি থাকে প্রাণ
> তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

(এবার ফিরাও মোরে ঃ চিত্রা)

মহর্ষির নির্দেশে জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন গেলেন পূর্ববঙ্গে — পাবনা রাজশাহী নদীয়ার, তখন পল্লিবংলার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও গভীর পরিচয়, প্রথম পরিচয়ও বলা যায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের সূত্রে দেখলেন গ্রামগুলির অবস্থা, গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাদের বেদনার অংশীদার হলেন শুধু নয়, তাদের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করতে চাইলেন। দেশের নেতারা তখন রাজনৈতিক উদ্দীপক বক্তৃতায় মুখর, আর রবীন্দ্রনাথ সব কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে যথার্থ দেশব্রতীর মতো যুক্ত হলেন গ্রামসংস্কারের কাজে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনব্যাপী গ্রামপুনর্গঠনের প্রয়াসের এই কাজকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে — প্রাক্-শ্রীনিকেতন কাজ যা তাঁর নিজের জমিদারিতে সংগঠিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ১৯২২ সাল থেকে শ্রীনিকেতনে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করা হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। জমিদারি এলাকায় পল্লিপুনর্গঠনের কাজ ছিল সমাজের বিভিন্ন অংশকে অংশীদার করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া।

সমাজ ও পল্লিপুনর্গঠনের সম্বন্ধে যে ভাবনা ও কর্মপদ্ধতি রবীন্দ্রমানসে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল তার প্রথম প্রয়োগ তিনি নিজে পতিসর শিলাইদহ সহ পূর্ববঙ্গে তাঁর জমিদারি এলাকায় করেছিলেন। প্রথমে ১৩১৫ সলে (১৯০৮-এ) কালীমোহন ঘোষের সাহায্যে, পরে আবার ১৩২২ সালে (১৯১৫) পতিসরে, নতুনভাবে। কিন্তু পল্লিউন্নয়নের ভাবনার বিভিন্ন দিক যে তাঁর মনে ক্রমশ দানা বাঁধছিল, তার প্রকাশ জমিদারি এলাকায় বসবাসকালে তাঁর নানা লেখায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন ১৩১২ ও ১৩১৩ বঙ্গাব্দে **ভান্ডার** পত্রিকায় কৃষি-শিক্ষা-লোকশিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে, **বঙ্গদর্শনে** লেখা 'স্বদেশী সমাজ' ও 'সমূহ'তে সংকলিত লেখায়। সময় যত এগিয়েছে গ্রাম ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত উচ্চকিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক সম্মেলনে স্বাভাবিকভাবে তাঁর বিভিন্ন সময়ের ভাষণে গ্রামের সমস্যাগুলি স্থান পেয়েছে। শ্রীনিকেতনের পল্লিপুনর্গঠনের প্রয়াস প্রকৃত অর্থেই এই কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ ছিল। তাঁর জমিদারি এলাকায় কাজের সময় থেকেই পল্লিপুনর্গঠনের কাজের যে মূল চিন্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল তা' হল — আত্মশক্তি, সমবায় ও উন্নয়নের উদ্‌বোধন । তার প্রকাশ শ্রীনিকেতনেও দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ১২৯৬ সনে সর্বপ্রথম পারিবারিক জমিদারির হিসেবপত্র দেখার দায়িত্ব পান, ১৮৮৯ সাল তখন ইংরেজির। ঐ বছর ১১ অগ্রহায়ণ সপরিবারে তিনি বিরাহিমপুর পরগণার শিলাইদহে সর্বপ্রথম পৌঁছন। প্রকৃতির সঙ্গে, বিশেষত গ্রামবাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত সেইসময় থেকেই। দেখলেন গ্রামের ভগ্নদশা, জীবনযাত্রার সামঞ্জস্যহীনতা, মানব সম্বন্ধে বিকৃতি, বিচ্ছিন্নতা ও অসাম্য। গ্রামের যে ভগ্নদশা পাবনা কংগ্রেসে দেশের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন তার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই ১৯৩৪ সালের শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে যখন তিনি গ্রামের দৈন্যদশা দূর করতে না পারলে দেশে বিপ্লব দেখা দিতে পারে বলে মত প্রকাশ করলেন। গ্রামের করুণ অবস্থা লক্ষ করে বললেন ধনবন্টনে কৃত্রিমতার মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রকান্ড ব্যবধান — 'ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে।' বললেন দেওয়া-নেওয়ার

'সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ ত্রুটির মধ্যে দিয়েই হয় বিপ্লবের সূচনা। একধারে সবকিছু আছে আর একধারে কিছুই নেই এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যই আনে প্রলয়।'

(উপেক্ষিতা পল্লী ঃ রবীন্দ্রনাথ)

কীভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজ করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে একটি রূপরেখা দিয়েছিলেন —

কতকগুলি পল্লি লইয়া এক একটি মন্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মন্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মন্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্প, শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভান্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মন্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মন্ডপ থাকিবে, যেখানে কর্মে আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা সালিশের দ্বারা গ্রমের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

(সভাপতির অভিভাষণ ঃ সমূহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৩২১-এর ফাল্গুনে এবং ১৩২২ সলের বৈশাখে বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর সভায় কবি গ্রামের হিতসাধনের রূপরেখা পুনরুল্লেখ করেন। এমনকি নিজের জমিদারিতে তাঁর ভাবনাকে বাস্তবয়িত করার লক্ষ্যে পল্লিপুনর্গঠনের সংবিধান রচনা করে তা' প্রচার করেছেন। এই সংবিধানের ৮ ও ৯ নম্বর ধারায় কৃষি-উন্নতিকল্পে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা ও জীবিকার্জনের জন্য গরুমোষ পালন, কৃষিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ধর্মগোলা স্থাপনের উল্লেখ আছে। নিজের জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের যে কাজ শুরু করেন তাকে ৬টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —

১) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ
২) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা
৩) গ্রামের জন্য রাস্তা নির্মাণ ও তার মেরামত, কুয়ো তৈরি করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা ইত্যাদি।
৪) মহাজনি ব্যবস্থার থেকে গ্রামের কৃষকদের জন্য ব্যবস্থা করা
৫) কৃষি ও শিল্প
৬) সালিশি বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন

রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে পল্লিপুনর্গঠনের কাজকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে ঃ—

১) **প্রথম পর্ব (১৮৯৯-১৯০৬)** শুরু হয় ১৮৯৯ সালে তাঁর একক প্রয়াসে। শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন জমিতে নতুন ধরনের ধান চাষ, আমেরিকান ভুট্টা, নৈনিতাল ও আমরাগাছি আলুর চাষ, পাটনাই মটর, আখ, কপি; রাজশাহীতে রেশম চাষের চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফল হন। কৃষি সংক্রান্ত এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন নিজের অর্থ ব্যয় করে। উদ্দেশ্য ছিল নতুন চাষের প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন। ১৯০৫ সালে শিলাইদহ ও পতিসরে চাষিদের ঋণ পাওয়া যাতে সহজসাধ্য হয় তার জন্য কৃষিব্যঙ্ক ও তাঁত শিক্ষার কেন্দ্র গঠন করা হয়। কৃষিকাজকে আরও সংহত রূপ দেওয়ার জন্য ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গোপালন শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। একবছর পর পাঠান জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও। রথীন্দ্রনাথ ফিরে এসে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা জমিতে কৃষিখামার ও কৃষিবিষয়ক নানা ব্যাপারে experiment-এর জন্য ল্যাবরেটরি গড়ে তোলেন।

২) **দ্বিতীয় পর্ব (১৯০৮-১৯০৯)** শুরু হয় ১৯০৮ সাল থেকে বিরাহিমপুর পরগণায় শিলাইদহে ভগ্নদশা গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কাজের মাধ্যমে, গ্রামের লোকদের নিয়ে তাদের নিজেদের দ্বারা অবস্থার উন্নতি করার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। এই পর্বের কাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে যোগদান করেন কালীমোহন ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও অন্যান্যরা।

৩) **তৃতীয় পর্ব (১৯১৫-১৯৪০)** এই পর্বে পতিসরকে কেন্দ্র করে কালিগ্রাম পরগণায় গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ আবার নতুন করে শুরু হয়। পতিসরে মন্ডলী প্রথাকে ভিত্তি করে গ্রামোন্নয়নের সূচনা হয়। এলাকার শক্ত এঁটেল মাটি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দেবার ব্যবস্থা সহ গ্রামের কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন, বয়ন ও মৃৎশিল্পের উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য কুয়ো নির্মাণ, পুকুরসংস্কার, ধর্মগোলা স্থাপন, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণদান, সালিশি বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন, ২০০টি প্রাথমিক স্কুল, পতিসরে হাইস্কুল, তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি স্থাপনাদির মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের নানা কাজ করা হয়।

চাষিদের ঋণজর্জর অবস্থামুক্তির জন্য চিন্তাভাবনা ছিল রবীন্দ্রনাথের। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ফসলের ক্ষতি হলে তাদের দেয় খাজনা মুকুবের যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। কিন্তু সমবায় ব্যঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল সেই সময়কার সমাজব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ১৯০৫ সালেই পতিসরে তিনি কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। নোবেল পুরস্কারের

অর্থ এইখানেই জমা রেখেছিলেন । বার্ষিক ৮ হাজার টাকা সুদে অর্থ চাহিদা মিটত। কিন্তু ১৯৩০ সালে Rural Indebtedness আইন প্রবর্তন হলে ঋণগ্রস্ত চাষিদের ঋণ মুকুব হয়, ফলে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ হারাতে হয় রবীন্দ্রনাথকে ও শান্তিনিকেতনকে ।

এই সময় কাজকর্মের উল্লেখযোগ্য একটা দিক হল সালিশি বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন। এটি শুধু অভিনব নয়, যুগান্তরকারী একটি পদক্ষেপও বটে। এব্যাপারে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'তে জানিয়েছেন —

তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশী বিচারে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম এই দুই পরগণায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে, এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনোরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে,... এই বিচারসভার বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপীলের সুযোগ দেবারও ব্যবস্থা করা হল। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগণার পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপীল-সভা নির্বাচিত হল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হত। পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপীল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বিচারের জন্য বাদী বা বিবাদীর কোনো ব্যয় বহন করতে হত না, কেবল দরখাস্ত করার কাগজ কেনার জন্য সামান্য মূল্য দিতে হত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল প্রজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবে — আদালতে যাবে না।

আদালতের সাহায্য বিনা, বিনা ব্যয়ে বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার শুরু থেকেই প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করেছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই দীর্ঘ কয়েকবছর এই ব্যবস্থা এত অনায়াসে চলেছিল। ছোটবড় কোনরকম বিবাদ নিয়ে আদালতে নালিশ করতে যাওয়া তারা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা নিজেরাই নিয়েছে বলে গভর্নমেন্ট কখনো আপত্তি তোলেনি বরং উৎসাহ দিয়েছে। এই বিচার প্রবর্তিত হবার বহু বছর পরে আমাকে যখন পরিদর্শনের জন্য শিলাইদহ বা পতিসরে যেতে হত আমার বেশিরভাগ সময় যেত প্রজাদের আপীলের বিচার করতে। তাদের মোকদ্দমা অধিকাংশ জমিজমা-সম্পর্কিত। আমি আশ্চর্য হতুম অশিক্ষিত কৃষকদের আইনজ্ঞান দেখে। তাদের সঙ্গে যুঝতে আমাকে Bengal Tenancy Act ভাল করে আয়ত্ব করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে বাক্‌পটুতার জন্য তাদের খ্যাতি ছিল। নিতান্ত অক্ষমদের বিশেষত মেয়েদের মামলা চালানো তাদের ব্যবসা হয়ে গিয়েছিল।

...মাঝে মাঝে বেশ কৌতুকজনক আরজিও উপস্থিত হত, কিন্তু বিচারকের আসনে বসে হাসা চলে না, গম্ভীরভাবে আমাকে রায় দিতে হত। শাশুড়ি-বৌয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে, তার বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পত্তি ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হবে, একটিমাত্র পুকুর, তাকে দুভাগ কি করে করা যায়, না করলে উপায় নেই। একই ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে জায়েদের মধ্যে রোজই ঝগড়া লাগে, ফলে রান্না হয় না। ভাইয়ের মধ্যে কেউই খেতে পায় না — বিচিত্র কত-না নালিশ শুনতে হত।

'কালীগ্রাম হিতৈষী সভা' তৈরী হয়েছিল। প্রজারা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়েছে, খাজনা আদায়ের সময় তারা খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা অতিরিক্ত দেয়। অতিরিক্ত এই আয় হিতৈষী সভার নামে পৃথক তহবিলে রাখা হয়, একসময় আয় ছিল বার্ষিক ৫-৬ হাজার টাকা এই হিতৈষী সভার। উল্লেখযোগ্য, সালিশি বিচারব্যবস্থার ফলে গ্রামের লোকেদের মধ্যে অযথা মামলা মোকদ্দমাতে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা কমে যায় অনেক। এর ফলে যেমন অর্থের সাশ্রয় হত, তেমনই বিবাদ-বিসংবাদের ফলে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে আরও বিভাজন গড়ে দেওয়ার প্রবণতাও কমে যায়। রবীন্দ্রনাথের এই সালিশি বিচারের ব্যবস্থা পল্লীজীবনে স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রবর্তন করার একটি উদাহরণ।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শকে ১৯০১ সালে প্রথমে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও পরে ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। শ্রীনিকেতন একটি গ্রামপুনর্গঠনের প্রতিষ্ঠান এবং একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়েরও অঙ্গ। এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পল্লিউন্নয়নকে অঙ্গীভূত করে নেওয়াটা সেকালে যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ ছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে লোকহিতসাধনে অধীত বিদ্যাকে সঞ্চারিত করা।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন এও উপলব্ধি করেছিলেন —

> ''আমাদের দেশে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে দেরি করে না।... নিরুৎসাহ, অবসাদ, অকর্মণ্যতা, রোগ-প্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত তাহলে দেখতে পেতাম এদেশের একপ্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু, সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়।''

(বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২)

তাই স্বাস্থ্যসচেতন করতে চেয়েছিলেন দেশের মানুষকে। জনস্বাস্থ্যবিষয়ক তাঁর ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে পল্লিপুনর্গঠনের পরিকল্পনায়। স্বাস্থ্য সমিতি গড়ে তুলে ব্রতী বালকদের উদ্বুদ্ধ করে কলেরা-নিরাময়, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক প্রভৃতি কাজে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য-উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লিউন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক গভীর সমাজ-দর্শন। গ্রামে আধুনিকতার আশীর্বাদ থাকুক কিন্তু অভিশাপটুকু যেন না থাকে এমনই ছিল তাঁর ভাবনা। তাছাড়াও শ্রীনিকেতনের পল্লিপুনর্গঠনের কাজ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গঠনের কাজের অত্যতম বলিষ্ঠ অঙ্গ ছিল। সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক ভাবনা, স্বদেশের স্বরূপ নির্ণয়, সমাজ জীবনের সাংস্কৃতিক চেতনা উন্মেষের ও তার নানা দিক নিয়ে কবি যে শুধু গঠনমূলক কাজ করেছিলেন তা'নয়, তাকে একটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই পল্লিপুনর্গঠনের কাজকে এক অর্থে সমাজের নৈতিক পুনর্গঠন (moral reconstruction) বলা যেতে পারে। এমনই মনে করেছিলেন বীরভূমের পল্লিজীবন ও পল্লিসংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী ও গবেষক দীক্ষিত সিংহ।

'ভারতবর্ষ তার গ্রামকে হারিয়েছে', রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। ঘটনাটি একদিনে ঘটেনি, তারও বেশকিছু পর্যায় আছে। যখন ব্রিটিশ শাসনাধীনে ইংরিজি শিক্ষা ও চাকরির লোভে ও মোহে ভদ্রলোকেরা গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি খুঁজলেন শহরে, তখন এই সরে আসার কারণে সমস্যা তৈরি হল। এই সমস্যার সমাধান ও জনসাধারণের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র পুনঃস্থাপন করা এবং সমাজজীবনে ক্রমশ বিলীয়মান স্বাভাবিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সমাজে যে বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ তৈরী করছে তারঅবসান ঘটানো প্রয়োজন আর এভাবেই পল্লিজীবন আবার তার নিজ মহিমায় ফিরতে পারে এমন ভাবনা তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন এক সমাজ যেখানে মানুষ তার নিহিত শক্তির বলে সমস্ত অংশের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে তুলবে এক সমবেত ঐক্য ও সংহতির আদর্শ। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, জোর দিয়েছিলেন সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের ওপরেও। আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসনের, আত্মশক্তি অর্জনের, জনগণের আত্মকর্তৃত্বের চর্চা ও দেশের অনশনক্লিষ্ট মুমূর্ষু মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কষ্ট লাঘব করার। শহর এবং গ্রামের দেওয়া-নেওয়াটুকু আরেকবার শুরু করিয়ে দেওয়াই ছিল কবির উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ একটা আত্মীয়-সমাজ চাইছেন যেন। গ্রাম যেন একটা পরিবার — সেই পরিবারটিকে তিনি খুঁজতেন। আত্মশক্তি, সমবায় ও প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মাধ্যমে বিশ্বচেতনা — এই-ই যেন রবীন্দ্রনাথের পল্লিগঠনচিন্তার মূল্যবান মৌল ধারণা। আত্মশক্তির সকল অর্থ পরনির্ভরতা

থেকে মুক্তি, নিজের ভিতরকার শক্তির উপর নির্ভরতা। আর একটু বাড়িয়ে বলা যায় আত্মার শক্তি। মানুষ যখন অপরের সঙ্গে সদর্থে নিজেকে যুক্ত করে সেই শক্তিই আত্মার শক্তি। আর এইভাবে আত্মশক্তি কার্যত যুক্ত হয় সমবায়ের ধারণার সঙ্গে। আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে সমবায় তখনই একটা ব্যাপকতর সংজ্ঞা ধারণ করতে পারে যখন তা মানুষের সঙ্গে মানুষের যে আচার-সংস্কারের প্রাচীর গড়ে উঠেছে তা' ভাঙতে সাহায্য করে। এই দূরদর্শী সমবায় বিভেদকে অতিক্রম করে বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত হবার কথা বলে। আর এই সংযুক্তির মানসিকতা নিয়ে যায় বিশ্বচেতনায়। যেমন আমরা আত্মশক্তি থেকে সমবায়ে, তেমনই সমবায় থেকে বিশ্বচেতনায় চলে যেতে পারি — 'যেথা গৃহের প্রাচীর বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি।' এর সঙ্গে মিশেছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা। কেদিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবে গ্রামসমাজ। সমবায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রসারিত করবে; অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গেও যেন তার আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে — এমন চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরিপূর্ণ জীবনদর্শনের জন্য রাজনীতির চেয়ে সংস্কৃতি আরও মূল বস্তু। সংস্কৃতি হবে চালকশক্তি। অভাব ও প্রয়োজন ছাড়াও জীবনের আরও একটা দিক আছে — তা হল আমোদের দিক — সবই একসঙ্গে সকলের কল্যাণের চিন্তা করে সমবেত হবে — মিলনের আনন্দে — সেটাও পল্লিসংগঠনের একটা রূপ। উৎসবের মধ্যে তার প্রকাশ। উৎসব অর্থে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এমন কিছু যেখানে ধর্মনির্বিশেষে মানুষ যোগ দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেখানেও পথিকৃৎ — মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগকে ভিত্তি করে তিনি ঋতু-উৎসবের উদ্যোগ নিয়েছিলেন — বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব। আকাশভরা সূর্যতারায় সঙ্গে একাত্মতা বোধের আনন্দ তার উৎস। এইভাবে পল্লিজীবনে যদি আনন্দের স্পর্শ লাগে, পল্লিবাসী যদি জাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে মিলনের এক প্রশস্ততর ক্ষেত্র খুঁজে পায়, তবে আশা করা যায় পল্লিউন্নয়নের প্রেরণাও বৃদ্ধি পাবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু 'পৃথিবীর কবি' নন, তিনি কর্মীও। কবিসত্তার প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে, আর কর্মীসত্তার প্রকাশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পল্লীপুনর্গঠনে। বস্তুত, অধীত বিদ্যাকে সমাজের, বিশেষ করে গ্রামসমাজের হিতসাধনের জন্য প্রয়োগ করার এই ধারণা সেদিনের প্রেক্ষিতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে ভেবেছিলেন, 'সমস্ত জ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থল অধিকার করা প্রয়োজন', সেই ভাবনার মধ্যে নতুনত্বের পাশাপাশি ছিল স্বদেশবোধের গভীরতা ও দূরদর্শিতা। আমরা দেখলাম, নিজের ভাবনাকে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবায়িত করেছেন বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে এই কাজে ব্রতী করেছিল, সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছিলেন —

> যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রম করে, আমি সকলের বন্ধু, আমি কবি।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঃ পল্লীপুনর্গঠন

দীক্ষিত সিংহ, রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০

বিদ্রোহী মানিক

অর্পিতা ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ

তখনও রবীন্দ্রনাথ জীবিত, শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র তরুণ সত্যজিৎ। ১৯৪১-র ২২শ্রে শ্রাবণের (৮ আগস্ট) ভোরবেলা তার বন্ধু দিনকর কৌশিককে নিয়ে কবির অসুস্থতার খবর পেয়ে সকালবেলা ট্রেন ধরে হাওড়া। কবির প্রয়াণ তখন হয়ে গেছে। দুঃসংবাদ মাথায় নিয়ে হেঁটে জোড়াসাঁকোতে পৌঁছলেও ভেতরে যেতে পারেননি। তারপর কবির মরদেহ নিয়ে যে ভয়ঙ্কর জঘন্য মর্মান্তিক দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুকে বলেছিলেন 'Patriotic Vultures of Culture are having a field day ! Come Dinu we go homewards.' এখান থেকেই সেই বিদ্রোহী শিল্পী সত্তার পরিচয় যেন তৈরী হয়ে যায়। এটা আমরা সকলেই জানি, মানি যে শিল্পীর চিন্তায়, শিল্পকর্মে আশেপাশের জীবন সংগ্রাম প্রতিফলিত হতে বাধ্য। শিল্পী যদি হানাহানিতে নাও থকেন তবু তার কারবার তো জীবন নিয়ে, তাই তিনি চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পান জীবনের জটিলতাকে। তেমনি দেখতে পান জীবনকে বদলে দেবার সংগ্রামটিকেও। আর কেউ যেভাবে দেখেনি সেভাবে জীবনকে দেখছেন, আর কেউ যেভাবে কোনো জিনিষকে দেখেনি তাকে দেখাকেই বলে শিল্প।

সত্যজিতের জন্ম এমন একটা সময়ে, যখন প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। উদার মানবিকতার প্রভাবে গড়ে ওঠা উনিশ শতকের বাংলার চেতনার পাড় ভেঙে যাচ্ছিল সে সময়। বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ মার্কসীয় মতবাদ ও বিপ্লবের ভাবনার আশ্রয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সত্যজিৎ যখন একজন কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক, তখন আমরা IPTA-র উন্মেষ দেখতে পাই নতুন মতবাদের হাতিয়ার হিসেবে। মার্কসবাদী চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও সত্যজিৎ তাঁর চারপাশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন।

লেনিন বলেছিলেন — একটি বস্তুকে জানার অর্থ হলো বস্তুর সঙ্গে চিন্তার সঙ্গতি ঘটাবার অর্ন্তলীন প্রক্রিয়া এবং যেহেতু প্রক্রিয়া গতিশীল, তাই তাতে দ্বন্দ্ব থাকবেই। দ্বন্দ্বের সমাধানও কোন না কোন ভাবে বেরিয়ে আসবে। সত্যজিৎ অনেকটাই যেন এ বিশ্বাসকে আত্মস্থ করেছিলেন। তার চলচ্চিত্র নির্মাণকালে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই। তাই দায়িত্বশীল, সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তিকে দেখিয়ে আমাদের সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন —

"I am interested in people, in human beings in human character, in their interplay, in the relationship of characters. That fascinates me in itself."

সত্যজিৎ যখন কলাভবনে পড়তেন, সেখানে হোস্টেলে খাবার দেওয়া হত দুপুর সওয়া বারোটা আর রাত আটটায়। মাঝখানে খিদে পেত সবার। তখন মানিকের মনে পড়ত চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ' ছবির কথা — ক্ষুধার্ত বন্ধুদের গল্প শুনিয়ে রুম থেকে ডাইনিং হল-এ যেতে যেতে বিলাস ভ্রমণের ঢঙে সমস্যার সমাধান করতেন।

'পথের পাঁচালি' থেকেই সত্যজিৎ রায় ভিন্নধর্মী, কোনো শ্রেণী সংগ্রামের কথা সেখানে নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু ছবিটি নতুন দিগন্ত দেয়। ঠিক যেমন এর কাহিনীকার বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় 'কল্লোল' প্রজন্মের হয়েও কল্লোল পত্রিকায়

লেখেননি অথচ সেই জীবন যন্ত্রণার যথার্থ চিত্র তাঁর কলমের এক আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার। সিনেমাটি শহুরে মধ্যবিত্ত প্যানপানানির থেকে মুক্ত এক গ্রামীণ জীবনের সন্ধান দেয়। পথের পাঁচালির শেষে দেখেছি গ্রামের দরিদ্র মানুষ ঘর ছেড়ে যায়, আর সাপ এসে সেই ঘর দখল করে। একটি কথাও সরাসরি না বলে একটি বড় নির্যাতনের কাহিনী বলা হয়ে গিয়েছিল। হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গার প্রতি আমাদের অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় একটি বাউল গানের মাধ্যমে। সত্যজিত দেখাতে চেয়েছিলেন বানিয়া শাসিত ভারতে ক্রমে মানুষের মহৎ আবেগ, সব কোমল বৃত্তি ব্যবসার পণ্য হয়ে গিয়েছে। পথের পাঁচালিতে আমরা শুনেছিলাম কন্যাহারা পিতার হাহাকার — 'দুগ্‌গা' — বলে, কিংবা চারুলতাতে বিছানার ওপর পড়ে ঠাকুরপো নাম নিয়ে কাঁদা। মানুষকে ভালোবাসলে, তীব্রভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে তবে তার দুঃখে দুখী হওয়া যায়, তার সঙ্গে কাঁদা যায়। আর মানুষকে চাবি দেওয়া পুতুল মনে করে শুধু বৌদ্ধিক সমস্যার সমাধান করলে শিল্পসৃষ্টি হয় না। আর এখানেই সত্যজিৎ ব্যতিক্রম। তবে 'দেবী' ছবিতে এসে তিনি সত্যিই ব্যতিক্রমী হলেন।

সত্যজিৎ নিজেকে কখনো নাস্তিক্যবাদী ঘোষণা করেননি। ভারতীয় দেবদেবীদের পুরাণ কাহিনী ও ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পান বলে জানিয়েছেন। তবুও ধর্মীয় সংস্কারের প্রভাব মুক্ত ছিলেন। কারণ পারিবারিক সূত্রে তিনি যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সেকালের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর ছিলেন। মূর্তি পূজার বিপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল অংশের সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের প্রতিভার পরিচয় আমাদের সবার জানা। কিন্তু যে দিকটা সম্পর্কে আমরা যথাযথ অবহিত নই, তাহলে সুকুমার রায়ের সংস্কার-মুক্ত বৈজ্ঞানিক মানস। ১৩১৭ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে দুটি প্রবন্ধ পাওয়া যায় সুকুমার রায়ের লেখা। 'চিরন্তন প্রশ্ন' এবং 'দৈবেন দেয়ম'। ১৩৬৩ সালে প্রবন্ধ দুটি কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' নামক বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাতে সুকুমার রায় লিখেছিলেন —

> ''সত্যিকারের বাস্তব খবরের চাইতে অমূলক বাজার গুজবের প্রতিপত্তি যেমন প্রবল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের তুলনায় অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টের মোহপ্রভাব তেমনি অনেক বেশি। স্পষ্টভাবে যাহাকে দেখি শুনি ও জানি তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দু কথায় তাহার নারীনক্ষত্রের হিসাব ফুরাইয়া যায়, কিন্তু যাহাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সম্ভব অসম্ভব নানা ডালপালায় পল্লবিত হইয়া সে মনের কল্পনাকে ভরাট করিয়া রাখে। তাই প্রত্যক্ষ আলোকের চাইতে অস্পষ্টতার আবছায়াই মনের মধ্যে অধিক সম্ভ্রমের সঞ্চার করে। স্পষ্ট শাসনের ভয়ে যে শিশু বিব্রত হয় না, সেও দেখি জুজু নামক অনির্দেশ্য পদার্থটিকে যথেষ্ট খাতির করতে জানে।''[১]

কিংবা —

> 'ইংরেজিতে যাহাকে বলে সুপারস্টিশন, বাংলায় তাহারই নামান্তর করা হয় কুসংস্কার। উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে, শুভাশুভ লক্ষণ বিচারে, তিথি-নক্ষত্রের নানা উপদ্রবে, হাঁচি, টিকটিকি আসন মুদ্রার মাহাত্ম্যে প্রসঙ্গে সে জিনিসটার জাল বিস্তার হইতে দেখি, তাহাকে কুসংস্কার বলিলে অনেক রাগ করেন। বলেন, 'তুমি কি এমনই দিগ্‌গজ ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছ যে কিসে কি হয় না হয়, সমস্ত জানিয়া শেষ করিয়াছ?''[২]

মাত্র আড়াই বছর বয়সে বাবা মারা গেলেও তার পুত্রের ওপর এই র‍্যাশনালিস্ট মানবিকতার বিকাশ বেশি দেখা যায়। দেবী আমার মতে আজ পর্যন্ত এদেশে যত ছবি তৈরী হয়েতে তার মধ্যে প্রচন্ড আপসহীন এবং সুদূর প্রসারী। এখানে শিল্পী হ্যাঁচকা টান মেরেছেন মনের সবচেয়ে গভীরে রক্ষিত ও রোপিত মূলটি ধরে তা হল ধর্ম। আমরা সকলেই জানি এদেশের শাসকশ্রেণী ধার্মিকতার একটা ভান সবসময়ে রক্ষা করে চলে। কুম্ভমেলায় যাওয়া, মন্দিরে যাওয়া, পুজো দেওয়া, নির্বাচনের

আগে পরে জ্যোতিষীদের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া, ধর্মকে আফিমের মত প্রত্যেক ঘরে পৌঁছে দেবার বিপুল প্রচার। আজকের বিপদকে সত্যজিত অনেক আগে অনুধাবন করে মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধিবাজ চলচ্চিত্রকাররা ধর্মের তল্লাট মাড়ায় না। কিন্তু সত্যজিত এই ট্যাবু ভেঙেছেন। সবচেয়ে বে-আইনি কথাগুলো সবচেয়ে সোচ্চারে বলেছেন। তার কথাগুলো সবাই যদি মানত তাহলে অযোধ্যায় ইটপূজোও হত না।

'দেবী' ছবির পিছনে স্পষ্ট অনুভূত হয় কুসংস্কার ও ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বাংলার সংগ্রামের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। পুরো ছবির বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদের মধ্যে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বামপন্থী আন্দোলনের স্পষ্ট উপস্থিতি। ১৯৬০-র 'দেবী'-তে আক্রমণের বিষয় ছিল কালিকিঙ্কর রায়ের মত উগ্র কালিসাধকের যুক্তিহীন গোঁড়ামি এবং অন্ধভক্তিবাদী বিশ্বাস, যা ক্রমশ আমাদের দেশে বেড়েই চলেছে। ১৯৬৫-র 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ'-এ তাই ঐশ্বরিক বাবাদের ভণ্ডামির আর শঠতার চিত্র। পরশুরাম আর সত্যজিৎ রায় দুই র্যাশনালিস্টের একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। এই বাবারা যে সমাজের ধনাঢ্য শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে শুরু করে অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল জড়বুদ্ধির বিষ ছড়িয়ে চলেছে তা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয়। বিরিঞ্চিবাবার মত জোচ্চর সাধুদের ভণ্ডামির মুখোশটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছেন।

ধর্মব্যবসায়ীদের অতিপ্রকৃত শক্তিতে সত্যজিতের কোন আস্থা না থাকলেও পুনর্জন্ম, জাতিস্মরবাদ ইত্যাদিতে স্পষ্ট তার কোনো অবিশ্বাস নেই। সোনার কেল্লা (১৯৭৪) কাহিনীটি গড়ে উঠেছে যে জাতিস্মরবাদকে কেন্দ্র করে, সেটি মূলতঃ বিজ্ঞান বিরোধী। আজ পর্যন্ত তার কোনো প্রামাণিক সত্য বিজ্ঞানী মহলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অথচ সত্যজিত রায় 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার ডেরেক ম্যালকমকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এই সিনেমায় পুর্নজন্ম এবং প্যারা-সাইকোলজির বিষয়টি যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে দেখান হয়েছে। এগুলো খোলা মনে দেখা উচিত।

১৯৭৬-এ জনঅরণ্য সেখানে ভণ্ড ধার্মিক আর ভক্তদের বিদ্রুপ করেছেন, সেখানে নায়ক সোমনাথ ও দালাল নটবর মিত্র ঘুষখোর অফিসারদের খুঁজতে পার্কস্ট্রীটের অভিজাত বাড়ির ভজন গানের আসরে যায়। সেখানে বিদেশী ভোগ্যপণ্যের জন্য Excess Tax দেওয়া ভক্তদের দেখিয়েছেন সত্যজিত রায়। এটা অবশ্য শংকরের মূল উপন্যাসে ছিল না। কিন্তু সত্যজিৎ একটা সিকোয়েন্সে এটি রেখেছিলেন। ভণ্ডামির নগ্নতাকে প্রকট করবার জন্য 'জনঅরণ্য'-তে জরুরী অবস্থার বলিষ্ঠ বিরোধিতা ছিল। দেওয়াল লিখনে, পরীক্ষা কেন্দ্রের গণ টোকাটুকির দৃশ্য। 'জনঅরণ্য' রাজনৈতিক প্রতিবাদ উত্থাপন করে থেমে থাকেনি। বুর্জোয়াসমাজ যে সবকিছুকে বিকিকিনির বাজারে টেনে নামায় — নারী জাতির প্রতি ভক্তির আড়ালে যে নারী মাংসের ব্যবসা চলে তারও খতিয়ান দিয়েছেন সত্যজিত।

১৯৭৮-এ 'জয়বাবা ফেলুনাথ' মূলতঃ এটি ছোটদের জন্য হালকা রহস্য উপন্যাস ছিল। সিনেমার শুরুতে রিক্শাতে তোপসের সঙ্গে বেনারসে লালমোহন বাবুর প্রণামের দৃশ্যে ফেলুদার প্রশ্ন ছিল তেত্রিশ কোটি দেবতাকে পেলেন কিনা? তেমনি মছলিবাবার আসরে ভক্তদের দেখে তাঁর প্রশ্ন ছিল তারা কি সব সাজানো ভক্ত? অর্থাৎ ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি একধরনের অনাস্থা তার ছিল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ম্যানেজার বলেছিলেন — "বলেন কী? এঁরা হচ্ছেন সবাই ক্রীম অব কাশী"। ঐযে দেখুন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর", অর্থাৎ সমাজের শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও ভণ্ড বাবার প্রতি অবিচল বিশ্বাস সমাজের অন্তসারশূন্যতাকেই তুলে ধরেছেন।

ধর্ম প্রসঙ্গে সব চাইতে সোজাসুজি এবং স্পষ্টভাবে সত্যজিত রায় তার মতামত ব্যক্ত করেছিলেন লণ্ডনের একটি সাক্ষাৎকারে। বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে আইজাকসন সত্যজিত রায়কে নানা প্রশ্নের মধ্যে ধর্মবিষয়ে একটি সিরিয়াস প্রশ্ন করে বসেছিলেন — তার অনুদিত অংশটি এরকম —

'আপনি কি ধার্মিক ? আপনি কি মনে করেন যে ঈশ্বরকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ? অথবা মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে?'

সত্যজিতের উত্তর ছিল — ''আমার নিজের অনুভূতি হচ্ছে যে মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে, হ্যাঁ আমি তাই মনে করি। কিন্তু প্রাণের শুরুর ব্যাপারের রহস্যটা থেকেই যাচ্ছে।... আমার মনে হয় না ঈশ্বর এমন কিছু একটা ব্যাপার যাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তার কোনো প্রয়োজনীয়তাই আমি দেখি না।... বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর আস্থা রাখাটা অনেক বেশী জরুরী। আমি অবশ্য অধ্যাত্মবাদ, প্রেমতত্ব অথবা প্ল্যানচেট্-এর মত অনুভূতিমূলক ধারণাগুলিতে অবিশ্বাস করি না।''[৩]

ঈশ্বরে অবিশ্বাসের পাশাপাশি প্রেততত্ব বা প্ল্যানচেটে বিশ্বাস কিছুটা contradictory মনে হলেও পরবর্তীকালে প্রফেঃ শঙ্কুর কাহিনীগুলোতে সত্যজিত বুঝিয়েছেন অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র সন্দীপ রায়ের একটি লেখা — My father, in the Journal Youth Times, 1976 উল্লেখ করা যেতেই পারে, 'তার ভেতরে কোনোরকম কুসংস্কার নেই এবং তিনি কোনো কিছুতেই বাঁধাও দেন না। ফলে তরুণদের পক্ষে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করাটা খুবই সুবিধাজনক। ... আমার বাবা কোন ছবির প্রথম দিনের স্যুটিং-এর আগে কোনরকম মহরত অনুষ্ঠান করেন না। কিন্তু 'জন-অরণ্য'-এর প্রথম শটটি যখন নেওয়া হচ্ছিল প্রযোজক কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, ক্যামেরার গলায় মালা পরালেন। আমার বাবার মুখটা তখন দেখবার মত হয়েছিল।... তিনি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করছেন।''

তবুও ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সত্যজিৎ স্বদেশে বিশেষ কোনো কারণেই হোক বা স্বইচ্ছায় হোক বেশি কথা বলেন নি। কিন্তু অন্য একটি ঘটনার দিকে আমাদের নজর দিতেই হয়। ১৯৭৫ সালে Illustrated Weekly of India পত্রিকার সম্পাদক খুশবন্ত সিং ভারতবর্ষের বিশিষ্ট কিছু মানুষকে একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। 'Why I am a Hindu ?' তার উত্তরগুলি ধারাবাহিকভবে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিয়েছিলেন সত্যজিত এবং সেটা ছিল বলিষ্টতম উত্তর।

> ''আমি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কিছুই নই —
> আমি একজন বাঙালি এবং সেইটেই আমার
> একমাত্র পরিচয়।''

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 'হীরকরাজার দেশে' ছবিতে দড়ি বেঁধে শাসকের মূর্তি টেনে ধুলিসাৎ করার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত। শুধু তাই নয় হীরক রাজার কথার মধ্যে একটা গ্রামীণ ভঙ্গী আছে, কারণ সত্যজিত জানতেন এই ধরনের মানুষ জোতদারদের চেয়ে বেশি cultured নয়। তাহলে মানুষকে পদদলিত করার কথা তার মাথাতেই আসত না। কাগজে বাঘ স্বৈরাচারী হীরক রাজাকে প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সত্যজিত । ছবির মূল কাঠামো ছিল খনি শ্রমিকদের বিদ্রোহ। জরুরী অবস্থা যে আসলে শ্রমজীবী মানুষকে দমন করার উদ্দেশ্যে আইন সেটা সবাই ভুলে যান। আর এখানেই সত্যজিত আলাদা, এখানেই সত্যজিৎ আধুনিক। শ্রমিককে ভুলতে পারেন না বলেই তৈরি করেন সদ্গতি। সেখানে ভারতীয় মজদুরের শ্রমক্লান্ত ঘর্মাক্ত মুখ অন্য সবশ্রেণীর মানুষের মনে আঁকা হয়ে যায়। মজদুর দুভাবে চিহ্নিত হয় — (১) শ্রমিক (২) ছোটজাত। এই সামাজিক সত্যকে তুলে ধরে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার দিক তুলে ধরেছেন। বর্ণ ও শ্রণীর সম্পর্ক, ভারতের শ্রমিকদের সংগ্রামের পূর্বকথাকে বাদ দিয়ে আচমকা আজকের ভারতীয় শ্রমিককে সে দলে টানা যায় না, সদ্গতি সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গণশত্রু, ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের চিরন্তন দ্বন্দ্ব কীভাবে সমাজকে অস্থিতিশীল করে তেলে, তার কাহিনী। ডঃ অশোক গুপ্ত যিনি বুঝতে পারেন — চণ্ডীপুরের ত্রিপুরেশ্বরের মন্দিরের সোয়ারেজ লাইনে ফাটল ধরলে, সেই জল পান করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডঃ চান মন্দির বন্ধ করে জলাধার সংস্কার হোক। কিন্তু শহরের ধর্মব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদেরা তা মানবে

কেন? তাই ডাক্তার গুপ্তকে বানিয়ে দেওয়া হয় গণশত্রু। ইবসেনের Enemy of the people নাটকে ডঃ স্টকম্যান শেষ পর্যন্ত একা হয়ে যায়। কিন্তু সত্যজিত 'গণ শত্রু'-তে এ নাটকের ছায়া অবলম্বন করলেও ডঃ গুপ্তকে একা করেননি। তিনি নতুন আশা দেখিয়েছেন। গণশত্রু আমাদের ভঙ্গুর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অস্থির ও নিস্ফলা রাজনীতি, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিকেও চিত্রিত করে যা নিয়ে সত্যজিতও ক্ষুন্ন ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীতে রাজনীতি বনাম ব্যক্তির দ্বন্দ্ব দেখিয়ে বলেছিলেন রাজনীতিতে সমাজের উপকার হচ্ছে না। আর গণশত্রুতে দেখালেন মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোক কীভাবে জনগণের সাথে প্রতারণা করতে পারে। প্রভাবশালীদের কথায় না চললে সে সংবাদপত্র টিকিয়ে রাখা যায় না তার পরিচয় 'জনবার্ত'র সম্পাদক হরিদাস। Yellow Journalism-র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

'শাখাপ্রশাখা' সুবিধাবাদী অসৎ মধ্যবিত্তের ছবি। অর্থলোভের ভয়ংকর ছবি। যেখানে একটি শিশুও শিখে ফেলেছে ২ নম্বরী কথাটা। বড়লোক হওয়া ধর্মের চেয়েও জরুরী। এ বাড়ির ছোট ছেলে জোচ্চুরীর প্রতিবাদে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। সে কমিউনিস্ট। পূর্ব ইউরোপের সমাজ তন্ত্রের বিপর্যয়ে সে বুকভরা বেদনায় নীরব হয়ে গেছে। একমাত্র যোগাযোগ তার আগ্রহের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক সেখানকার নীরবতাও অনেক কথা বলে।

আগুন্তুকের মনোমোহন মিত্র ঘর ছেড়েছিলেন ১৯৫৫ সালে। সে বছরই পথের পাঁচালি মুক্তি পায়। যুক্তিবাদী সভ্যতা থেকে বাইরে বেরোনোর প্রস্তুতি। পৃথ্বীশ কে মনে পড়ে? সে মনোমোহনকে প্রশ্ন করেছিল 'ক্যানিবালিজমকে আপনি সভ্যতার কোন স্তরে ফেলবেন? মনোমোহনের উত্তর ছিল 'সভ্য কে জানেন? — সভ্য হচ্ছে সেই মানুষ যে আঙুলের চাপে একটা বোতাম টিপে একটা ব্রহ্মান্ড নিক্ষেপ করে একটা গোটা শহরকে সমস্ত অধিবাসী সমেত ধ্বংস করে দিতে পারে। ছবির শেষে যখন অনুতপ্ত অনিলা আর সুধীন্দ্রকে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তির পুরোটা দিয়ে বিদায় নেন, তখন ইংরেজি অভিধানের সবচেয়ে লম্বা শব্দটি ২৯টি অক্ষরের শব্দটি উচ্চারণ করেন, যার অর্থ Setting little or no value। বিদ্রোহী মানিক চিত্রিত করার প্রচেষ্টাটা হয়তো তাই। কিছুই বলা হল না। তবুও তারই মধ্যে যে স্বল্প আয়োজন তা দিয়ে একটা Cinematic frame তৈরী করার চেষ্টা মাত্র।

উল্লেখপঞ্জী —

১) সুকুমার রায়, বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ। কলকাতা সিগনেট প্রেস, ১৩৬৩, পৃ. ৫১

২) তাদেব পৃ.-৬২

৩) Sight and Sound (International Flm Quaterly) Summer, 1970, London British Film Institute, P-119

অণুরণন

রম্যানি চট্টোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

সময়টা ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাস। সবে কয়েক মাস যোগমায়া দেবী কলেজে আংশিক সময়ের শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছি। কয়েকজন সহকর্মী একসঙ্গে বইমেলায় গেলাম। ছোটবেলা থেকে বাবা মায়ের হাত ধরে অনেকবার বইমেলায় গেছি, বই কিনেছি। কিন্তু এবার বিষয়টা একটু স্বতন্ত্র। আমি আর ছাত্রী নই, শিক্ষিকা। ভালোলাগার বিষয়গুলো নিজে থেকেই পরিশীলিত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে চিন্তাভাবনা। নিজে সামান্য হলেও কিছু টাকা উপার্জন করছি। তাই গল্পের বইয়ের বাইরে কিছুটা দামি বই কেনা এখন সম্ভব আমার পক্ষে। দেখলাম উদ্বোধন কার্য্যালয় এর স্টলে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী রয়েছে। আমি এগিয়ে গিয়ে বইটা উল্টে পাল্টে দেখে কিনে ফেললাম। সেই থেকে পড়ে চলেছি চিঠিগুলো। সব চিঠি এখনো পড়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বেশ কিছু চিঠি একাধিকবার পড়েছি। কেন জানিনা প্রতিবারই নতুন কিছু খুঁজে পাই চিঠিগুলোর মধ্যে। আজ আমি খুব ব্যস্ত। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে সহকারী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান। কাজের চাপে চিন্তা চেতনা, রুচি প্রকৃতির ওপর একরাশ ধূলো। কিন্তু ওই একটা বই বেদ উপনিষদের মতো হয়ে রয়েছে আমার কাছে। অন্ধকার সমুদ্রের নাবিককে কম্পাসের মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে যেন। প্রতিটা চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে স্বামীজির কঠোর সংগ্রামী মন, গভীর আত্মপ্রত্যয়, যুক্তিবাদ। আমার মতো সাধারণ মানুষ যা থেকে সহজেই খুঁজে পেতে পারে প্রতিকূলতাকে জয় করে যথার্থ জীবনচর্যার সাহস, বেঁচে থাকার প্রকৃত রসদ। তাই স্বামীজির জন্মদিনে কয়েকটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে নিজেকে ধন্য মনে করছি;

৯৪ নম্বর চিঠি, নিউ ইয়র্ক থেকে ২রা মে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মিস ইসাবেল ম্যাককিন্ডলীকে লেখা।

চিঠিতে তিনি বলেছেন;

"আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই তো ভাই-ই। পৃথিবীতে একটি জিনিসই আমি ঘৃণা করি-বুজরুকি।"

১৪৮ নম্বর চিঠি, শিকাগো থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা। চিঠির এক জায়গায় বিবেকানন্দ বলেছেন,

"I want to be a voice without a form", অর্থাৎ নামের আবশ্যক ছাড়াই সকল অন্যায়ের প্রতিকারে সরব হতে চেয়েছেন, প্রচারের আলোয় আসতে চাননি। এই চিঠিতেই তিনি বলেছেন;

"Everything must be sacrificed, if necessary, for that one sentiment-universality." অর্থাৎ সার্বজনীনতা রক্ষার জন্য সবকিছুই ছাড়তে হতে পারে। তিনি বলেছেন "perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others"। অর্থাৎ তোমার কাজে, তোমার উদ্দেশ্য সাধনে অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারও যেন পদদলিত না হয়।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক থেকে মিস মেরী হেলকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, "সমাজের

সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ, আর যে তাহা করে না, তাহার পথ কন্টাকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।"

লেখার শেষে উল্লেখ করছি স্নেহের মার্গারেটকে ইংল্যান্ড থেকে ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫ সালে লেখা একটি চিঠি। যেখানে অতি সংক্ষিপ্তাকারে অনুপ্রানিত করেছেন তাঁর প্রিয় শিষ্যাকে" ...পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।...আমার ভালোবাসা জানবে।"

চিঠিগুলোর মধ্যে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এক অনন্য যুক্তি নির্ভর, স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী সমাজ সংস্কারককে, ধর্মের বেড়াজাল পেরিয়ে যাঁর স্থান সত্যিই সপ্তর্ষি মণ্ডলে। চিঠিগুলো এতটাই আত্মবিশ্লেষণী যে আমার মতো ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধৃষ্টতা নেই অধিকতর বিশ্লেষণের। এক্ষেত্রে অনুধাবন সহজসাধ্য না হলেও অনুসরণ মনে শান্তি দেয়, পথ চলার সাহস যোগায়। তাই শত কোটি প্রণাম জানাই বিবেক জাগরণের পথিকৃৎ বিবেকানন্দকে।

(তথ্যসূত্র ঃ পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা)

আমার বাংলাকেন্দ্রিক জীবন

সৌমিতা মিত্র, অতিথি অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ

বাংলা ভাষা আজকের দিনে কিছু মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয়, আবার কারুর কাছে বাঁচার রসদ। মনের মণিকোঠায় কত জমানো কথা আজ ভীষণ বলতে ইচ্ছে করছে। ছোটবেলা ঘিরে রেখেছিল ঠাকুরমার ঝুলি, টুনটুনির গল্প, হাঁদা-ভোদা, নন্টে-ফন্টেরা। আজকের সদা ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে লুকিয়ে একটা সুন্দর জগৎ। যেখানে আজও বিকেলে আকাশে টিয়াপাখির ঝাঁক, নারকেল, আমগাছের শান্ত ছায়া দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় 'ক্ষীরের পুতুল' এর মায়া রাজ্যর কথা। শহরের গলিতে যখন কোনও ফেরিওয়ালা হাঁক দেয় — ''চন্দ্রপুলি সন্দেশ নেবেন, মোয়া নেবেন'' — মনে করিয়ে দেয় চিনিবাস ময়রার কথা। আজও আমার আশেপাশের চেনা বৃদ্ধাদের — কষ্ট, বেঁচে থাকার চেষ্টা মনে করিয়ে দেয় ইন্দির ঠাকরুণকে। পুঁইশাক-এর মতো তুচ্ছ জিনিসও যে কতটা আনন্দদায়ক হতে পারে তা হয়ত ক্ষেন্তির থেকে ভালো কেউ জানে না।

বাংলা ভাষা যে এত সুন্দরভাবে মানুষের মনকে তার সাহিত্য ভান্ডার, ঐতিহ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করতে পারে তা নিজের জীবনে না উপলব্ধি করলে বুঝতেই পারতাম না। আজ অনেকেই এই ভাষাকে তুচ্ছ করে, সেখানে এই ভাষা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ভাষার কাছে আমি চিরঋণী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মাতিয়ে রেখেছে বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষদের গান, কবিতা, ছোটগল্প ইত্যাদি দিয়ে। বাংলার যে সৌন্দর্য যে রূপলাবণ্য তা দেখলেই মুগ্ধ মন বলে ওঠে ''বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি''। মন বার বার বলে আমি ফিরে আসতে চাই এই নদী, মাঠ, ক্ষেত ভালোবেসে শঙ্খচিলের দেশে।

জীবনের দুঃখ তাপ, বেদনার উপশমের জন্য আমরা শরণাগত হই বাঙালীর প্রাণের কবি রবি ঠাকুরের কাছে, যার অজস্র সৃষ্টির মাঝে লুকিয়ে আছে দুঃখ সহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র। সামাজিক নান জটিলতা, না পাওয়ার যন্ত্রণা, মনটাকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী করে গেলে। মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, অপমান আমাদের কি বিদ্ধ করছে না? নাকি আমরা আজ বড্ড আবেগহীন হয়ে গেছি। আমরা আর পারছি না পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলার সাহিত্যিকদের অজস্র সৃষ্টির দ্বারা। ''মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনের'' মত আজ ''সময় কেটে যায় মুঠো ফোনে''।

জীবনে আমাদের কিছু চাহিদা থাকে; যা সোনার পাথর বাটির মত অপূর্ণ, কিন্তু এই যে একটা মানুষ একটা ভাষাকে কেন্দ্র করে দিনযাপন করে যায় — ''বাংলায় হাসি, বাংলায় কাঁদি, বাংলায় জেগে রই'' এর তাৎপর্য অসীম।

ভোরে ঘাসে শিশিরবিন্দুতে যে সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, গাছের ছায়া ঘেরা রাস্তা যেভাবে এঁকে বেঁকে অচিন পথের সন্ধান দিয়ে যায়, মন বার বার সেই দিকে ছুটে যায়।

আমার ভাবতেও খুব ভালো লাগে যে আজ এই যান্ত্রিক শহরের মধ্যে থেকেও আমি যে স্বস্তির শ্বাস নিতে সক্ষম তা শুধুমাত্র ''বাংলা ভাষার'' জন্য; যা অক্সিজেনের মত প্রয়োজনীয় আমার জীবনে ভালো থাকার জন্য।

প্রতিদিন আমি এই ভাষাকে নিয়ে উদ্‌যাপন করতে চাই, এগিয়ে যেতে চাই আর গর্বের সঙ্গে বলতে চাই —

''বাংলা ভুলি কি করে, বাংলা বুকের ভিতরে''।

বাংলা ভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতায় (আন্তর্জালিক) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

আমি চাই নেপালি ছেলেটা গিটার হাতে আমি চাই তার ভাষাতেই গাইতে আসবে কলকাতাতে

বৃন্দা বৈশ্য সাহা, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, বাংলা সাম্মানিক, চতুর্থ সেমেস্টার

গুলমোহরের ঝরাপাতায় সোনার গুঁড়োর মত হলদে হয়ে আছে রাস্তাটা, ভাষাদিবসের মিছিল আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট গলির বাঁকে। বুকের কাছে গীটার চেপে ধরে নেপালি ছেলেটা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে থার্মোকল আর ফুলে সুসজ্জিত ‘‘অমর একুশে’’ লেখাটির দিকে। এই বাংলায় মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো সে স্বপ্ন দেখে কল্লোলিনি কলকাতার বুকে গান গাওয়ার। সামান্য চাপা নাকে মুখে, আত্মবিশ্বাসের উজ্জ্বলতা স্পষ্ট। মাইকে অবিরাম বেজে চলা, ‘‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলতে পারি’’-র সুরে সুরে মাথা দোলাচ্ছে ছেলেটা। চোখে কি তার অশ্রুকণা চিকচিক করে উঠল এক মুহুর্তের জন্য ?

ছেলেটা মঞ্চে উঠেছে এবার। গিটারের তারে আঙ্গুল বুলিয়ে ছুঁয়ে দিল কপালে, তাপরর জি কর্ডে সহজ প্রগ্রেশনে ধরল গান। সুরেলা কণ্ঠে ঝরে পড়ছে ‘‘আমি বাংলায় গান গাই / আমি বাংলার গান গাই / আমি আমার আমিকে চিরদিন / এই বাংলায় খুঁজে পাই’’। এত সুস্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ! মাথার উপর চাঁদোয়া করা কৃষ্ণচূড়ার ফাঁক গলে রোদের জরি এসে আঁকিবুকি কাটছে ছেলেটার মুখে। অন্তরা ধরেছে এইবার, কিন্তু নেপালি অনুবাদে। একই সুরে মিশে যাচ্ছে ভাষা, বিলীন হচ্ছে ভেদাভেদ। তার বন্ধ চোখের কোল বেয়ে নামছে এককুচি জলের বিন্দু।

এই অশ্রু, এই রক্ত — এই যা কিছু বয়ে বেড়ায় আমাদের অন্তরের শাশ্বত আবেগ, তা সবকিছুই ভাষার জন্য। আমাদের একসূত্রে বেঁধে রাখার নিজস্ব মাধ্যমের জন্য। আমাদের মাতৃভাষার জন্য!

নেপালি ছেলেটার আঙ্গুল ঘুরছে গিটারের সি কর্ড থেকে ডি কর্ডে। ছেলেটা গাইছে এখনও। আমি চাই নেপালি ছেলেটা গিটার হাতে, আমি চাই তার ভাষাতেই গাইতে আসবে কলকাতাতে।

✠✠✠✠✠✠✠

বাংলা ভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতায় (আন্তর্জালিক) দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে

ঋষভ চ্যাটার্জী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

''ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী''

বাঙালি আলবাত ভুলতে পারে...

আমরা বলব আমাদের ছেলেপুলে ছাড়ুন, আমাদেরই বাংলাটা ঠিক আসেনা। আমরা, বিশ্বসাহিত্য পড়ে উল্টে দেওয়া আঁতেল হব, আর বাংলা অনার্স পড়া ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে খিল্লি ওড়াবো। ওদিকে বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা কমে আসবে আরো আরো।

এক বন্ধু তার নাটকে খুব ভাল বলেছিল — ''আমরা দৃষ্ট দুন্নকে ভুলে যোবো, কিন্তু Menelaus কে চিনতে ভুল হবে না''। আমরা Paradise Lost পড়ে ফেলব, মেঘনাদবধ কাব্য পড়া হবে না।

কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে প্রায় বড়বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্কের মঞ্চে বাংলা ভাষা ''নিষিদ্ধ'' হবে। বাংলায় দাঁড়িয়ে বাঙালি বিচারক রেখে বাঙালি বক্তায় হল ভরিয়ে ওরা আমাকে বলে ''Due to unavoidable circumstances we cannot 'allow' Bengali as the medium of this debate''। ইচ্ছে করে দুটো ঘুসি মেরে জিজ্ঞেস করি তোমরা কে ''allow'' করবার ? ইচ্ছে করে জানতে কি সেই ''unavoidable circumstances'', যা বাঙালিদের বাংলা বলতে allow করে না।

যদি জানতে চান কোন কোন প্রতিষ্ঠান, ঠগ বাঁচতে গাঁ উজাড় হবে। তবে ভাবতে ভালো লাগে, ৫-৬ বছর আগে না থাকলেও আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর হল তার সব বিতর্ক এই ভাষীক করেছে।

আমরা গায়েত্রী স্পিভাকের মাতৃভাষা থেকে অনুবাদের গুরুত্ব নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পড়বো, আর ওদিকে বিদেশিরা কবে আমাদের সাহিত্য অনুবাদ করবেন ইউরোপীয় কোনো ভাষায় তার জন্য বসে থাকবো।

বইমেলায় প্রধানত ইংরেজি সাহিত্যের প্রকাশনা সংস্থা হলগুলো পাবে, বাংলা বইগুলো অযত্নের পলকা স্টলে ধূলিধূসর হবে।

আজ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, তাকে ভুলতে পারি কিনা সেটাতো বাঙালি নির্ধারণ করবে।

বাংলা ভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতায় (আন্তর্জালিক) তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে

সুচেতা গোস্বামী, ইংরেজি অনার্স, তৃতীয় বর্ষ, আশুতোষ কলেজ

অবশেষে আবার এল একুশে ফেব্রুয়ারী। আজ আবার নিজের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দিন। শ্রদ্ধা না থাকলেও জোর করে মাতৃভাষা প্রেম দেখানোর দিন। আজ উথলে উঠবে ভাষার প্রতি ভক্তি। সোশ্যাল মিডিয়াতে চলবে ভাষার প্রতি বিশেষত বাংলা ভাষার প্রতি অহংকারের প্রতিযোগিতা। আজ সেই মা, যিনি নিজের ছেলের ভাষা সম্পর্কে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন, বাংলাটা না ঠিক ওর আসে না, বোঝে অবিশ্যি সবটাই; তিনিও আজ পোস্ট করবেন — ''আহা মরি বাংলা ভাষা''। সত্যই চক্ষুলজ্জা থাকা দরকার এই সকল ইংরেজি পুঁথি পড়া তথাকথিত বাঙালীদের।

কে বলবে, এই ২১শে ফেব্রুয়ারীতেই নাকি প্রায় সত্তর বছর আগে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে, বর্বর পুলিশের লাঠি এবং কাঁদানে গ্যাসকে নস্যি মনে করে একদল ছাত্র প্রতিবাদ মিছিলে বের হয় শুধুমাত্র বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা প্রদান করবেন বলে। হয়তো এই কথা শুনে, সেইসকল তথাকথিত ইংরেজি পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনে মনে হেসে মুখে একরাশ দুঃখ প্রকাশ করে বলবেন, তাইজন্যই তো এই ২১শে ফেব্রুয়ারী 'বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দিন। সত্যিই কি তাই, 'সারাবছর ধরে বাংলাটা আমার ঠিক আসে না বলে, ইংরেজি কমেন্ট পোস্ট করে, বাংলা ভাষা শুনে বা বলা যায় নিজের ভাষা শুনে মুখ বেঁকিয়ে বাংলা ভাষার যে অবমাননা করা হয়, তা এই একদিনেই সোশাল মিডিয়ায় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ঝড় তুলে গঙ্গাস্নান করে এই একদিনেই তো পাপ মুক্তির দিন, তাই না?

আজ সত্যই ইংরেজি মিশ্রিত বাংলা পড়লে হাসি পায়, মনে হয় সত্যিই এই ভাষাই কী কবিগুরুর ভাষা, এই ভাষাই কী অমর্ত্য সেনের ভাষা। পাশের বাড়ির একজন গর্বিত বাঙালী পুত্রের নাম পূরব। গোবেচারার মত, একদিন সেই বাঙালীকে শুধিয়েছিলাম, এহেন নাম রাখার কারণ কী ? জবাব এল পরে ছেলে বিদেশ-টিদেশ গেলে যদি লোকের উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়। তাঁর স্ত্রী আবার সামাল দেওয়ার জন্য বলে উঠলেন, মেয়েদের নাম পূরবী হলে ছেলেদের নাম পূরব হলে দোষ কী? দেষের আর কী? হ্যারি পটারকে বুকে নিয়ে সুনীল, নারায়ণকে ভুলে যাওয়া বাঙালীর দোষের আর কী। আক্ষেপ শুধু বিশেষ দিনগুলোতে আবেগপ্রবণ ডায়লগ লিখে ভাষা নিয়ে ন্যাকামোগুলো শুধু বেমানান এই যা।

আজকাল বাঙালী গায়কদের গালমন্দ করে আমরা বেশ মজা পাই। লেখা নাকি আর আগের মতো হচ্ছে না। আচ্ছা লেখাটা যদি ভালোও হয় তাহলে আমরা কী নিশ্চয়তা দিতে পারবো যে লেখাটা লোকে পড়বে? 'সমাদরই তো শিল্পীর সব থেকে বড় পুরস্কার। সেই সমাদরই যদি না থাকে তাহলে উৎসাহ আসবে কোত্থেকে? অতএব শুধু একদিন গান গেয়ে, পোস্ট করে, বাঙালি পোশাক পড়ে বাঙালী সেজে বাংলা ভাষার গুণগান করে, আর বাকি দিনগুলোতে পিন্ডি চটকাবো, থাক বাবা এমন ভাষাপ্রেম।

'সাধারণ বাংলা মিডিয়াম থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে, যখন মা-বাবাকে বলেছিলাম, ইংরেজি বিষয় নিয়ে স্নাতক বা অনার্স করব, তখন বাবা বলেছিলেন শর্ত শুধু একটাই। ভুললে চলবে না টেনিদা, ফেলুদা, ঘনাদাকে। যতই তুমি টিনটিন, শার্লক হোমস, হারকিউল পোয়রটকে ভালোবাসো। ঘুমের আগে বিছানার পাশে থাকবে নারায়ণ দেবনাথ। হ্যাঁ, আজ আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী, তবে আমি কিন্তু বাংলাকে ভুলে গিয়ে ইংরেজি সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ ভাবে গা ভাসাতে পারিনি। পারবই বা কী করে, বাংলাটা আমার রক্তে আছে যে।

বিভূতিভূষণের 'দেবযান' সেদিন আবার নতুন করে পড়ছিলাম। শিউরে উঠছিলাম মানুষটার চিন্তার ব্যাপ্তি দেখে। পরের বইটা ছিল তুর্কির লেখক আইসে কুলিনের 'লাস্ট ট্রেন টু দ্য ইস্তানবুল'। ভাষা এমনই, দেশ, জাতির গন্ডি মানে না। সব ভাষার প্রতি ভালোবাসা না থাকলে যেমন নিজের ভাষাকে শ্রেষ্ঠ বলার অধিকার থাকে না, তেমনিই নিজের ভাষাকে না চিনলে ভিন রাজ্য বা দেশ বা ভাষাও কখনও আপন হবে না। সত্যিকারের বাঙালী হলে আমার মতে প্রতিদিনই হবে একুশে ফেব্রুয়ারি। ■

বাংলা ভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতায় (আন্তর্জালিক) বিশেষ প্রশংসিত রচনা।

ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে

দেবপ্রতিম পট্টনায়ক, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি

মার্কিন ঔপন্যাসিক ফিলিপ রথকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চেক লেখক মিলান কুন্দেরা বলেছিলেন — ''মানুষ জানে সে অমর নয় কিন্তু সে বিশ্বাস করে তার জাতি ও ভাষার মৃত্যু নেই।''

আবার যদি সে জাতির নাম বাঙালি হয় আর ভাষার নাম বাংলা তবে তো কথাই নেই।

আমাদের অনেক গর্বের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হলো বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষদের আত্মবলিদানের জন্যেই আজ সারা বিশ্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তবে বিশেষ এই ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনের মধ্যেই ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা সীমিত রাখা কখনোই কাম্য নয়। ভাষার সাধনা চিরকালীন, আজীবন।

আধুনিকতার বহর ও পুঁজিবাদের আগ্রাসনে সেই ভাষাই অগ্রাধিকার পায়। যাদের দাপট পণ্যবিশ্বের বাজারে রমরমিয়ে থাকে। আর তাই জন্য অনেক জায়গাতেই বাংলা ভাষা হিসেবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

অভিভাবকদের মধ্যে প্রবণতা বাড়ছে ইংরেজি আর হিন্দিতে বাচ্চাদের সাবলীল করানোর বাংলাকে উপেক্ষিত রেখে।

এছাড়াও অনেক জায়গায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, এই যে একের পর এক বাংলা মিডিয়াম স্কুল বন্ধ হচ্ছে তার কারণ নাকি বাংলা ভাষা ক্রমে মৃত ভাষায় পরিণত হওয়ার মুখে।

এইসমস্ত ষড়যন্ত্র কারা করছে কেন করছে সেই তরজায় না গিয়ে সহজভাবে বিষয়টাকে অনুধাবন করতে কয়েকটা তথ্য আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের অপপ্রচার রুখে দেওয়া যায়।

UNESCO-এর তথ্যানুযায়ী যে ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ১০০০০-এর কম একমাত্র সেই ভাষাগুলোকেই বিলুপ্ত পথগামী বা Endangered Languages বলে।

আর আমাদের বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা এই ভারতেই প্রায় দশ কোটি। এছাড়াও বাংলাদেশ আছে এবং অন্যান্য বহু দেশেও বাংলা ভাষায় কথা বলা বহু মানুষের বাস। আন্দাজ করা যায় সারা বিশ্বে বাংলা ভাষায় কথা বলেন প্রায় ২৩ কোটি মানুষ।

আজ আমাদের রাজ্যে হিন্দির যে আগ্রাসন আমরা লক্ষ্য করি তার দোহাই হিসেবে যেটা লোকমুখে প্রচারিত সেটা হলো হিন্দি নাকি আমাদের রাষ্ট্র ভাষা। অথচ সংবিধানের বিধান অনুযায়ী আমাদের কোনো রাষ্ট্র ভাষা বা জাতীয় ভাষা নেই, যেটা আছে সেটা হলো ২২টা সরকারি ভাষা। যার মধ্যে বাংলা তো আছেই।

আমাদের রাজ্যের বহু ব্যাংক ও সরকারি অফিসে বাংলাতে পরিষেবা নেই কিন্তু হিন্দিতে আছে অথচ আমাদের রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ হিন্দি বোঝেননা। এই যে আগ্রাসন তা কিন্তু সূক্ষ্ম সাম্রাজ্যবাদের আভাস দেয়। অথচ নিজের ভাষার জন্য রুখে দাঁড়িয়ে অধিকার দাবীর মতো জোট আমাদের নেই।

বাংলা ভাষা কিন্তু অনেক গভীর এবং বহুমাত্রিক। আমাদের বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা এবং সবটা নিয়েই আমাদের প্রাণের এই ভাষার অস্তিত্ব। তাই বাংলা ভাষার এই বহুত্ববাদী ধারা আমাদের গর্ব করার বিষয়।

কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন —

"একটা ভাষার উৎকর্ষ এবং আয়ু দীর্ঘজীবি হয় সেই ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ধারাটি বহমান রয়েছে কি না তার উপরে"।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়ে থাকে। এর বাইরে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, চেক রিপাবলিক, কানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের মোট ৩০টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। এসব গবেষণায় বিদেশি গবেষকেরা ছাড়াও বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের গবেষকেরাও যুক্ত আছেন।

চীনা ভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলির ৩৩ খণ্ডের অনুবাদ থেকে শুরু করে লালনের গান ও দর্শন ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। সোভিয়েত আমলে রুশ ভাষাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের ব্যাপক অংশের অনুবাদ হয়েছে। গবেষকেরা মনে করছেন, ইংরেজি, চীনা ও জাপানি ভাষার পরস্পর বাংলা ভাষা নিয়ে বিশ্বের আগ্রহ বাড়ছে। আজ আমাদের রাজ্য জুড়ে নানা জায়গায় আঞ্চলিক বই মেলা হয়, বই উৎসব হয় এবং সেই প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে আমরা হয়তো নামী দামী কর্পোরেট পাবলিশার্স-এর স্টল দেখিনা কিন্তু দেখি অগুনতি প্রকাশনী সংস্থা, আঞ্চলিক পত্রিকা গোষ্ঠী যারা অজানা অচেনা লেখকদের লেখা ছাপেন এই বাংলা ভাষাতেই। বহু এমন মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এমনকি সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র আছে যারা হয়তো অর্থনৈতিকভাবে লাভের মুখ দেখেননা কিন্তু তাদের প্রকাশনার ধারা অবিচল থাকে।

এই উদ্যমী মানুষদের দেখেই আমাদের এই আশ্বাস পেতে হবে যে বাংলা ভাষা ফুরিয়ে যায়নি, যেতে পারেনা। এই মানুষেরাই পক্ষান্তরে সারা বছরই যেন ভাষা দিবস পালন করেন , উদ্‌যাপন করেন।

ভাষা বরাবর চর্চার বিষয় কিছু সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আমাদের মনে বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টি করে আমাদের সেই চর্চার জায়গা থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, তাই এই ধরনের অপচেষ্টা রুখতে আমাদের বাংলা ভাষার চর্চাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বাংলা ভাষাকে শিখরে পৌঁছাতে হলে বাঙালিদের জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে স্বনির্ভরতার দিকে এগোতে হবে। বাংলা সিনেমা, বাংলা বই, বাংলার ব্যবসা যত উন্নত হবে ততই পণ্যবিশ্বে বাংলার মাটি শক্ত হবে।

বাংলা ভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতায় (আন্তর্জালিক) বিশেষ প্রশংসিত রচনা।

একুশ

সায়ন চক্রবর্তী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ

রক্ত তো একদিন থিতিয়ে পড়েছে কাদাজলে,
উৎসাহ জন্মে গেছে নিস্তব্ধ জলে মৃদু ঢেউ,
এখন শিরায় রক্ত জল হয়ে এলো তলে তলে,
'চেতনা' শব্দের কাছে আর ফিরে আসবে না কেউ।

সেদিন আগুন ছিলো, সব কালো ফেলেছিলো ঘিরে!
এখন প্রদাহ শান্ত, পড়ে আছে প্রশান্তির ছাই...
হয়তো সমস্ত তার, সব টান পড়ে গেছে ছিঁড়ে,
আমরা মূর্খের মতো এ ভাষার জয়ধ্বনি গাই।

আঁধারি-চর্যা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যায় বয়ে...
চণ্ডীদাস ফিরে চেয়ে দেখেন একাকী শ্রীরাধিকা,
কালিয়া মুচকি হেসে লুকিয়ে যান কথাটি না কয়ে
তমালের বনে, আর পদাবলি দেখে মরীচিকা।

অন্যদিকে ফুলিয়ায় ধূসর বিকেল ক্ষয়ে আসে...
প্রদীপের ম্লান আলো কলমের শরীরে জড়ায়,
কৃত্তিবাস আত্মমগ্ন লিখে যান, সীতা রাম শ্বাসে।
ঈশ্বরও নিষ্পলক সধৈর্যে দেখে যান ঠায়।

আলাওল ভাবছেন, মস্তিষ্কে ভাষার জাল, শিরা।
সন্ধ্যার দাওয়ায় ব'সে রামপ্রসাদী কী যে সুর গান!
ব্যাকুল সে ভাষা জানে তাঁরও নিদারুণ মর্মপীড়া...
অবিন্যস্ত চুল তাঁর, ক্রন্দনে আনত নয়ান।

এমন চিন্তার শিরা, ব্যাকুল কান্নার নোনাজলে
ধীরে ধীরে দৃঢ় হয় আমার প্রদীপ্ত বর্ণমালা —
যদিও চেতনা আজ পড়েছে বিভ্রমে...যাঁতাকলে,
তবু ইতিহাস জানে পোড়া আর পোড়ানোর জ্বালা!

ইতিহাসে কান্না আছে, বৃষ্টি আছে, যার রঙ লাল,
আমরা সব ভুলে যাই, আমরা সব ভুলে যেতে পারি।
সমস্ত হিসেব রাখা, সুনিপুণ দ্রষ্টা মহাকাল,
অনন্ত সময় ধরে হাঁটতে থাকে তাই ফেব্রুয়ারি।।

বাংলা ভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতায় (আন্তর্জালিক) বিশেষ প্রশংসিত রচনা।

ভাষা দিবস ঃ ভাবনায় ও যাপনে

অস্মিতা দত্ত, সাইকোলজি বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার, বেথুন কলেজ

‘‘এ নয়ন আমার আশা, আমার ভাষা আমার অঙ্গীকার’’

সমুদ্রের ঢেউ। কখনো উথালপাতাল আবার পরমুহূর্তে শান্ত গম্ভীর। মানুষের মনন অনেকটা সেরকম। স্থবির নয়, চঞ্চল। সেখানে অহরহ কত বিচিত্র প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমাহার। তা না থাকলে আর মনন কিসের ? আর মনের এই যে বৃত্তি, তার ওপর নির্ভর করে কত না নির্মাণ অবিনির্মাণ। সে থেকে আবার মানব মনের কত কিছুর অভিব্যক্তি। এই বৃত্তি থেকে গড়ে ওঠে শিক্ষা সংস্কৃতি সংস্কার প্রভৃতি। সেসব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। অভিযোজিত হয় জীবনযাত্রা। এ এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। জীবন সেজন্যে এইসব বৃত্তিকে কোনোভাবে স্বীকার করতে পারে না।

‘‘এরকম কেন হয়ে গেল তবে সব / বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে। / একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে / আবার বিশুদ্ধ হতে কত দিন লাগে ?’’ (‘‘ভাষিত’’, জীবনানন্দ দাশ)

ভারতবর্ষ জুড়ে যেভাবে একটি ভাষার দাপট বেড়ে চলেছে, তাতে বাংলা ভাষাটার চরিত্র নিয়ে কিছু অবধারিত প্রশ্ন উঠে আসে। সরকারি এলাকায় বাংলার বদলে হিন্দির দৌরাত্ম, বাংলা ভাষা যারা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে চর্চা করেন তাদের বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবনা কমছে।

ভেজালের মধ্যে ঢুকে পড়ছে কিছু আক্ষরিক অনুবাদ, ‘‘কেন কি’’, ‘‘তুই আমার পেছনে হাত ধুয়ে পড়ে আছিস’’ এইসব।

১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র আন্দোলন, উর্দু ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে মেনে না নেওয়ার আন্দোলন। হঠাৎ গুলির শব্দ। শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, এবং সাফিদুর। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো জাতি প্রাণ দিলো নিজের মাতৃভাষার জন্য। তারিখটা ২১এ ফেব্রুয়ারি।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘‘দুনিয়ার ইতিহাসে এত মানুষ কখনো প্রাণ দেয় নাই। দুনিয়ার ইতিহাস লেখা হলে, তা তোমাদের ছাড়া কখনো লেখা হতে পারে না।’’ সময়ের চাকা ঘোড়ে, যে জাতি একদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিলো, উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে, আজ একবিংশ শতাব্দীতে সেই জাতি বলে ওঠে, ‘‘আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না’’।

কিছুদিন আগে, এক দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে, ‘‘সা মোসা বলবো সিঙ্গারার বদলে’’। সত্যিই প্রতিবেদনটি ভাবিয়েছে আমায়। সত্যিই তো, দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষায় আজ খাদ মিশেছে।

ঠিক, ভাষা অনেকটা বহতা নদীর মতো। ব্যাকরণ, অভিধানের পরোয়া করে না। একটি শব্দকেই ভিন্ন স্থানের, ভিন্ন সামাজিক বা পেশার লোক ভিন্নভাবে উচ্চারণ করেন। ‘‘মান্য চলিত’’-এর পোশাক পরিয়ে তাকে ‘‘মান্য’’ করার ছলে ব্যহত করা যায় না।

এবার আসি বাংলা ভাষা, বাঙালিদের কথায়। দেখুন, অনেকেই এই অপপ্রচার চালান, হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা। না, ভারতবর্ষের আসলে কোন জাতীয় ভাষা নেই। সব ভাষাই সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ছ'শোর মতো ভাষা ভারতে এখনো

টিকেছে। তবে গত পঞ্চান্ন বছরে প্রায় আড়াইশো ভাষা লুপ্ত হয়েছে। আশঙ্কা, প্রত্যেক দু দুসপ্তাহে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে ভাষা ভাষীদের ইতিহাস, সংস্কৃতি।

বাঙালি মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে মূলত বংলায় লেখা জাতীয় সংগীত যে উচ্চারণে গাইছে, শুনছে, তাতে তার দেশপ্রেম জাগে না। কষ্ট হয়। সম্ভবত এই কষ্ট তামিলনাড়ু, বা সিকিমের মানুষজনের হয়, যদি তারা নিজেদের ভাষায় নিজের দেশের সবেচেয়ে প্রিয় গানটি শুনতে বা গাইতে না পারেন।

আমরা অনেক সময়ই জিজ্ঞেস করে ফেলি, ‘‘এই তোর ফার্স্ট ল্যাংগুয়েজ কি রে’’? অনেকেই বলে ইংলিশ, আসলে, প্রত্যেকটা বাঙালি জাতির ফাস্ট ল্যাংগুয়েজ আসলে বাংলা, তা তিনি বেহালাতে থাকুক, বা বেলজিয়ামে। whats up-এর বদলে, ‘‘কি রে কেমন আছিস’’টাই বেশি ভালো লাগে।

‘‘বাংলাটা ভালো লাগে না, কেন কি বাংলাটা outdated’’, বলা লোকজনই ফেসবুক এ ভাষা দিবসে পোস্ট করে ! এটাই ট্রাজেডি।

আমি এমন এক বাংলা চাই, যেখানে অভিভাবকরা বলবে না ‘‘আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না’’, বরং বাংলা না বলতে পারলে, বকে বলবে ‘‘বাংলা তোমার নিজের ভাষা’’।

বাড়ির বুক শেলফ-এ Sherlok Homes-এর পাশে যেন ফেলুদাটাও থাকে।

Tagore থাকুক, তবে ঠাকুরটাও যেন থাকে, কেবল ২৫এ বৈশাখ নয়, প্রতেকটি দিন।

এমন অনেক পেশা, নেশা, ইতিহাস, জীবন ইত্যাদি কে বহন করে চলে একটি ভাষা। ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’’ তাকে মান্যতা দেয়, কিন্তু তার প্রাত্যহিক, উদ্‌যাপনকে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তার জন্য নিজের এবং সকলের মাতৃভাষার জন্য সম্মান, ভালোবাসা চাই। একমাত্র সেই ভালবাসা আইন, বেয়নেট সব কিছুর মুখের ওপর জবাব দিতে পারে। ‘‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি’’, পাকিস্তানি সেনা পরিবৃত বাংলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। বাংলা ভাষা যেখানে উচ্চারিত হবে, সেখানেই বাঙালি এক মা ভূমির স্পর্শ পাবে।

বাঙালির ইতিহাস নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস আসলে কি? বাঙালি আসলে কে? একটা বিশেষ সামান্য ভূখণ্ড এবং একটা সমান্য ভাষা ছাড়া বাঙালিয়ানার আর কোনো সুনিশ্চিত লক্ষণ আছে কি? নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙালি অভিন্ন নয়। রীতিনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মসাধনা — তাতেও বাঙালির অনেক বৈচিত্র্য। উনিশ শতকে যখন জাতিসত্তা সম্পর্কে আমরা ক্রমশ কিছুটা পাশ্চাত্য মডেলে সচেতন হচ্ছি, তখন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে বাঙালি নিজের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নয়। বলেছেন ঃ ‘‘ইতিহাস বিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহেরনাম জানে না, এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙালি’’। খুব স্পষ্ট করে তিনি বলছে। ‘‘বাংলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালি কখনো মানুষ হইবে না।’’

মাঝে মাজে মনে হয়, কত কি হারিয়ে গেছে বাঙালি জীবন থেকে। কালের নিয়মেই অনেক কিছু হারায়। বিয়ে বাড়ির মেনু থেকে যেমন লুচি, বেগুন ভাজা ভ্যানিশ হয়ে ঠাঁই পেয়েছে বিরিয়ানি কিংবা চাইনিজ।

আমাদের আড্ডাটাও বদলে গিয়ে ‘‘Hangout’’-এর মলাট পেয়েছে। গত একদশকে কলকাতায় যতগুলি বাঙালি

রেস্তোরাঁ হয়েছে তা গুনত গেলে বুঝি দিন কাবার হবে। তবে আশির দশকে এমন কত রেস্তোরা ছিল তা নিয়ে ভাবতে হয়। এখন শুক্তো খেতে রেস্তোরাঁর দরজা পেরোতেই হয়।

বাঙালির ইতিহাসের একটা বড় দিকচিহ্ন বঙ্গভঙ্গ। স্বাধীনতার জন্য বাঙালিকে এইমূল্য দিতে হয়েছিল। তার ভালোমন্দ, ঠিক বেঠিক নিয়ে ইতিহাস কথা বলবে। কিন্তু হঠাৎ যখন এই বাংলায় কোন অঞ্চল, কম সম্প্রদায়, কোনো গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে বাংলাদেশি বলে তখনই বাঙালি বলে কিছুটা ধাক্কা লাগে।

খারাপ লাগে যখন ‘‘বাঙাল’’ বলে তার দেশের কথা বলা হয়, তাকে ব্যঙ্গ করা হয়। ‘কাঁটাতারের’ গায়ে লেগে যেন ছিন্ন হয়ে যায় এই বাঙালি আবেগ।

আজ এই কথাটা মনে রাখা ভালো যে বাঙালির ভারতীয়ত্ব কিন্তু তার বাঙালিত্ব খর্ব করে না। রাষ্ট্রের দিক থেকে বাঙালি বিভক্ত। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির অভিন্নতা দেশভাগের পরে সাড়ে সাত দশকেও খুব বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়নি।

‘‘রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি’’ — কবির এ আক্ষেপ বাঙালি শতাধিক বছর ধরে কপচে আসছে। বাঙালি কিসে মানুষ হবে, তার একটা ছবি বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় অন্বেষণের নিষ্ঠার অভাবের কারণেই বাঙ্গালীর আর মানুষ হওয়া হলো না।

যেমন ইচ্ছে বাংলার গল্প বানিয়ে ‘‘সোনার বাংলার’’ স্বপ্ন দেখানো সোজা, এবং ভাঙা বাংলা বলেও, রবীন্দ্রনাথ-এর উল্লেখ করেও হাততালি অর্জন হয়, তবে এর গভীরতা অল্পই।

এ অবস্থায় বাঙালি নিজেকে নিয়ে নতুন করে ভাববার যে একটা প্রয়োজন আছে, তা মানতেই হবে। কেবলমাত্র মহালয়াতে স্ট্যাটাস, কিংবা নববর্ষে ‘‘হ্যাপি নববর্ষ’’, বা সত্যজিতের জন্মদিনে ওনার ছবি দিয়ে বাঙালিত্ব জাহির করা যায়না। ব্যাপারটা একটা দিনের নয়, বা একটা উৎসবের নয়।

✠✠✠✠✠✠✠

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'-র "অণুগল্প" প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

স্বপ্নের সে দিনে...

অনুশ্রুতা দে, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, ভুগোল বিভাগ, স্নাতকোত্তর, ৪র্থ সেমিস্টার

বসন্তকাল শেষ হতেই হুড়মুড় করে গরমকালটা পড়ে গেছে যেন। কোকিলগুলো সব বিদায় নিয়েছে, নরম রোদটা হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ম। এই শীতেই দুর্গাপুর ছেড়ে এই নতুন জায়গায় এসেছে পিকলুরা। জায়গাটার নাম যেমন, তেমনই তার ছিরি! কোথায় দুর্গাপুরের মতো স্বপ্নের শহর আর কোথায় এই কংক্রিটের জঙ্গল। জায়গাটার নাম বারাসাত। পিকলুদের বাড়িটা অবশ্য বড় রাস্তার থেকে একটু ভিতরে, চারিদিক বড় বড় গাছপালা দিয়ে ঘেরা। তবে দুর্গাপুরের সাথে কোনো তুলনা হয় নাকি এই জায়গাটার! সেই খেলার মাঠ, সেই চেনা রাস্তাঘাট, বন্ধুবান্ধব, উফ্ এখনো ভাবলে মনটা কেঁদে ওঠে ওর। এইসব হাবিজাবি চিন্তা করতে করতে কখন যে বাড়ি এসে গেছে তা খেয়ালই করেনি পিকলু। জায়গাটার সবই বাজে, শুধু একটা, মাত্র একটা জিনিসই ভালো, আর সেটা হল পাশের হালকা গোলাপী রঙের দোতলা বাড়িটা। কেন ভালো? না, তার উত্তর জানেনা পিকলু। কিন্তু কি যেন আছে ওখানে, একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ওর ওই বাড়িটার প্রতি।

রিক্শা থেকে নেমে বাড়ি ঢোকে পিকলু। পিকলুর মা নেই। বাড়িতে সদস্য বলতে সে আর তার বাবা। বাবা দুর্গাপুরের হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন, ট্রান্সফার নিয়ে বারাসাত চলে এলেন এই শীতে। এই বদলি নেওয়ার কারণটাও বেশ অদ্ভুত। বাবার ছোটবেলা কেটেছে এই বারাসাতেই, তাই নাকি উনি এখন বারাসাতে আবার থাকা শুরু করবেন, নিজেদের সেই আশি বছরের পুরোনো বাড়িটায়। দাদু-ঠাকুমা মারা যাবার পর প্রায় দশ বছর ফাঁকা পড়ে থাকার পর তাকে মেরামত করে ওরা বাবা-ছেলে বারাসাতে এসেছে চার মাস হল। বাবা এখন বারাসাত হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক। পিকলু পড়ে বারাসাতের এক নামকরা বেসরকারি স্কুলে।

আজ তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাফ ছুটি হয়েছে। তাই আজ সন্ধ্যে অব্দি পিকলু বাড়িতে একা। স্কুলে সব কাজ মিটিয়ে বাবার বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে ছটা। হাত মুখ ধুয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে, নিজের ঘরেই বসেছিল পিকলু। হঠাৎ এক মিষ্টি রিনরিনে স্বরে "পিকলু" ডাকে চমকে উঠল সে। জানালার দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। জানলার কাছে গিয়ে পিকলু দেখে সেই গোলাপি বাড়িটার ছাদে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। বয়স পিকলুর মতোই, পনেরো কি ষোলো।

আবার সেই ঝিম ধরানো মিষ্টি গলায় সে বলল,

"আমিই ডাকছি তোমায়, একবার ছাদে এসো পিকলু"

মোহগ্রস্তের মতো ছাদের সিঁড়িতে পা বাড়াল পিকলু। ছাদে উঠেই দুপুরের কড়া রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। শুধুই কি রোদে চোখ ধাঁধাল? না, সেই মিষ্টি গলার মেয়েটার রূপেও খানিকটা চোখ ধাঁধাল। এর আগে যে, কোনো মেয়েকে ওর ভালো লাগেনি তা নয়, কিন্তু এই মেয়েটার চোখ দুটোই যেন অদ্ভুত এক মায়া ভরা। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে, খানিক ঘেঁটে যেতে যেতেও পিকলু বলল, "বলো"। আবার সেই ঝিম ধরানো স্বরে সে বলে উঠল, "তুমি পরী দেখেছ?" পিকলু এইবার একটু হেসে বলল, "ধুর, ওগুলো রূপকথার গল্পেই হয়। ওইসব বাস্তবে হয় না বুঝলে !"

"সব হয়। আচ্ছা বলো তো, এইটা রূপকথা নাকি বাস্তব ?"

‘‘কি সব বলছো ? পাগল নাকি তুমি !’’

‘‘না, আমি পরী’’ একটু ব্যঙ্গের স্বরে বলে ওঠে মেয়েটা।

ও, তাই বলো, তোমার নাম পরী। উফ্ দারুণ জোক্‌স বলতে পারো তুমি।’’

‘‘আমার কোনো নাম নেই। আমি একজন পরী। প্রতি ছ-মাসে একবার আসি এই বাড়িটায়। এই একটা দিনই পৃথিবীটা উপভোগ করতে পারি, বিশ্বাস করো। পিকলু, আমায় বিশ্বাস করো আমি একদম সত্যি বলছি। আমায় পৃথিবীর যা কিছু ভালো, তা দেখাবে আজ বিকেল নামার আগে, প্লিজ।’’

‘‘কিন্তু এরকম আবার হয় নাকি। আর এইটুকু সময়ের মধ্যে তোমায় কি-ই বা দেখাবো আমি।’’

‘‘সে তুমি জানো।’’

‘‘আচ্ছা তুমি একবার চোখ বন্ধ করবে, তাহলে একটু চেষ্টা করি আমি।’’ একটু ভেবে বলে পিকলু।

‘‘করলাম’’

‘‘এইবার আমার কথা মন দিয়ে শোনো ।’’ ধরো আমরা একটা জায়গায় গেছি, একটা বিশাল সবুজ মাঠ, দুপুর ফুরিয়ে বিকেল হচ্ছে। সূর্য ডুবছে, দূরে বইছে নদী, আওয়াজ আসছে জলের, মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়া জুড়িয়ে দিচ্ছে শরীর। সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে আর মায়ের গায়ের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। বাড়ি ফেরার সময় হচ্ছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠছে। রাস্তার দুপাশের ইউক্যালিপ্টাসের পাতা দুলছে হালকা হালকা। গাঢ় হচ্ছে সন্ধ্যে। মাঠ, রাস্তা সব ডুবে যাচ্ছে স্বপ্নের অন্ধকারে, ধীরে ধীরে...’’

‘‘চোখ খোলো এইবার’’

‘‘আহ্, কি দেখালে তুমি !’’

‘‘জানিনা কতটা সুন্দর এই জায়গা, কিন্তু এই জায়গা আমার দেখা সেরা জায়গা পৃথিবীর।’’

‘‘তোমার চোখ দিয়ে আমি কি মিষ্টি জায়গাই না দেখলাম। আচ্ছা তুমি মনে রাখবে আমায় ?’’

‘‘যেমন করে ওই জায়গাটাকে মনে রেখেছি তেমন করেই তোমায় মনে রাখবো।’’

‘‘একি, তুমি কাঁদছো ?’’

‘‘না না, একটু মায়ের কথা আর দুর্গাপুরের সেই পুরোনো পাড়ার কথা মনে পড়ে গেল।’’

‘‘সূর্য যে ঢলে গেল, এবার আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। তবে এইবার পৃথিবীর কাছে আমার এক অংশ পড়ে রইল, তোমার মনের ভিতরে। আসি তবে...’’

পিকলু অবাক হয়ে দেখতে থাকে, আস্তে আস্তে আবছা হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। শুধু সেই ঝিম ধরা কণ্ঠস্বর আর এই পড়ন্ত বিকেলের আভা ছেয়ে যায় পিকলুর মনের ভিতরে।

‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’-র “অণুগল্প” প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

উদ্বায়ু

তুহিন দাস

ম্যাকাউট ইউনিভার্সিটি, ফরেন্সিক সায়েন্স বিভাগ, স্নাতকোত্তর, ৪র্থ সেমিস্টার

১.

যতদূর চোখ যাচ্ছে খালি ভাসমান এক মরু অঞ্চল দেখতে পাচ্ছে সুদীপ্ত। আশেপাশে কত লোকজন, যানজট, ধাক্কাধাক্কি তবু সেসবের মধ্যে সুদীপ্ত যেন নিজেকে সুতোর রিলের মত পুরোটা গুটিয়ে ফেলেছে। আজ একটা ইন্টারভিউ ছিল সুদীপ্তর, মাস্টার্স শেষ হয়েছে মাস ছয়েক হলো কিন্তু কোনো কাজ নেই ওর হাতে। যদিও টুকটাক কিছু টিউশনি করে, তবে তা থেকে মাসের শেষে যা পায় তার অধিকাংশটাই মায়ের ওষুধ কিনতেই চলে যায়। ওর মা হাইপারটেনশনের পেশেন্ট, ছেলের চিন্তায় চিন্তায় ওঁর শরীরের এমন অবস্থা। কাল রাতে ওঁর শরীরটা বেশ খারাপ করেছিল, সুদীপ্ত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল ওর মা’কে। ভাবছিল যে রেসিউমে গুলো ও জমা দিয়ে রেখেছে নানা কোম্পানিতে, সেগুলোতে যদি ও লিখতে পারত, ওর মায়ের এরকম শরীর খারাপ, পরিবারে বাবা নেই, মাথার উপর নিজস্ব ছাদ নেই, ওর এখন এই চাকরিটার ভীষণ দরকার! — তাহলে যদি কোম্পানিগুলো ক্ষমাঘেন্না করে একটা চাকরি দিত ওকে। আজ সকালে বেশ আশা নিয়ে ও এসেছিল এখানে ইন্টারভিউটা দিতে, ভেবেছিল যে এই চাকরিটা ওর হয়েই যাবে, ডায়গনস্টিক সেন্টারে অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওর সাবজেক্টের সঙ্গে এক্কেবারে পারফেক্ট প্রফেশন। কিন্তু কপাল এমনই যে ভ্যাকেন্সি বাইরে থেকে টাকা দিয়েই কিনে নিয়েছে একজন। বাইরে বেরিয়ে ওর নিজের যাবতীয় শংসাপত্রগুলো জাস্ট ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল। এত কষ্ট করে নিজের মেধায় উত্তীর্ণ হয়ে কী-ই বা লাভ হলো ওর! প্রচন্ড চেনা কলেজস্ট্রিট মোড়টাও আজ যেন ওর কাছে গিঁটপাকানো দড়ির মতো লাগছে, ওর উপর দিয়ে ও যেন ব্যালেন্স করে হাঁটতে পারছে না। মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে গেলো নীচে, বিস্তীর্ণ গিরিখাত যেখানে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটনের স্রোত বয়ে চলেছে অনন্তের দিকে।

২.

সারাদিন পর যখন বাড়ি ফেরে আর্য্যা, তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন যেন ওই পরনের মাস্কটার মত মনে হয়। এত ব্যবহৃত হয়েছে, যে সুতোর মত করে যেন শরীরের প্রতিটা কোষ, ঠিকরে গুটি পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পাশের ঘরে অনন্ত তখন শুয়ে, রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ও শুয়ে পড়ে দশটার মধ্যেই, বেশি রাত অব্ধি ওকে জাগতে দেয়না আর্য্যা। এক্সিডেন্টের পর থেকে একদিক অকেজো হয়ে গেছে অনন্তর, তারপর থেকে সংসারের সকল দায়িত্ব এসে পড়েছে আর্য্যার ঘাড়ে। আর্য্যা প্রথমে মডেলিং করত, এখনও তাই-ই করে কিন্তু এখন মডেলিংটা প্যাশন থেকে প্রফেশনে বদলে গেছে। অনন্তর যাবতীয় খরচ, ফ্ল্যাটের ই.এম.আই. বলতে গেলে সবকিছুই সামলায় আর্য্যা একা হাতেই। অনন্ত কথা বলতে পারেনা ঠিক করে। মাঝেমধ্যে ছুটির দিনে হুইলচেয়ারে করে ওকে বাগানে ঘোরাতে নিয়ে যায় আর্য্যা। দুজন দুজনের হাত ধরে বসে থাকে, আর্য্যার কপালে বৃষ্টির ফোঁটার মত এসে পড়ে অনন্ত’র চোখের জল। অনন্ত সব বোঝে, আর্য্যা মাঝেমধ্যে রাতে কেন বাড়ি ফেরেনা, কেন মাঝেমধ্যে ওকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, সারা শরীরে আঁচড়ের দাগ কেন

থাকে — সব বোঝে ও কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারেনা, জমাট বাঁধা রক্তের মত ধীরে ধীরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আর্য্যার ইদানীং খুব ক্লান্ত লাগে নিজেকে, ও এসব মন থেকে চায়নি কোনোদিন — অন্য পুরুষের স্পর্শ, লালসা ইত্যাদি ওর উপর এসে পড়বে, ও চায়নি কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আজ ওর কাছে এ ছাড়া অন্য কোনো পথ যেন খোলাই নেই। সবকিছু সেরে প্রতিদিন যখন ও নিজের জগতে ফেরে তখন যেন মনে হয় এ পৃথিবীতে কি আদৌ ওর জন্য কিছু আছে? বোধহয় নেই, থাকলে কি আর ওকে এত কষ্ট করতে হত সারাজীবন!

৩.

মা আসছে দেখে হাত থেকে গল্পের বইটা রেখে পড়ার বইটা তুলে নিল সম্প্রীতি। ইশ! কি সুন্দর এগোচ্ছিল গল্প দুটো, সুদীপ্তর কী হলো, চাকরি পেলো কি না, আর্য্যার কী হলো জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওর। সত্যি বাবা, মাও যেন আসার সময় পায়না, ধুর !

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'-র ''অণুগল্প'' প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

অন্য রকম বাঁচা

ভূমিকা বোস, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, স্নাতকোত্তর, ৪র্থ সেমিস্টার

সেদিন ক্যাম্পাসের মধ্যে তার সব থেকে প্রিয় জায়গাতে বসেছিল তন্বী। প্রতিদিনের রোজনামচায় আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তন্বীকে। আগে কখনও এমনটা তাকে মনে হয়নি। দূর থেকে তাকে দেখে অনু, এক ছাত্রী এসে দাঁড়াল তার কাছে এবং বলল ''ম্যাম, আপনার ক্লাসটা আজ হবে?'' রাশভারী গম্ভীর তন্বীর কাছে এই প্রশ্নর পিছনে আবদার বড় কমই আছে। কী জানি কী মনে হল একটু হেসে তিনি জানালেন ''না আজ আর ভালো লাগছে না, বড় ক্লান্তি অনুভব করছি।'' বলেই নিজের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন। একটি ছাত্রীর সামনে দুর্বল হলেন তিনি, যা এতদিন তার শিক্ষক জীবনে একদিনও ঘটে নি। তাও নিজেকে সংশোধন করার কোনো চেষ্টা না করে প্রফেসর তন্বী বোস এগিয়ে গেলেন তার গাড়ির দিকে এবং অনু শুনল যে তিনি ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে যাবার জন্য। স্তম্ভিত অনু ভাবতে লাগল, যে শিক্ষিকাকে সে কোনো রসবোধ সম্পন্ন মানুষ বলে মনে করত না, তার মধ্যে আজ কিসের এত ক্লান্তি! অণু ক্লাসে জানিয়ে ইচ্ছে করেই সেই গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হল যেখানে মিস্ বোস এসেছেন। অনু সেখানে গিয়ে ম্যাডামকে দেখতে পেল এবং ওনার পাশে গিয়ে চুপ করে বসে পড়ল। মিস্ বোস তার দিকে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না।

কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই অনুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ''আমি বড় খারাপ শিক্ষিকা তাই না?'' অনু এই প্রশ্নের জন্য একদমই প্রস্তুত ছিল না, সে আমতা আমতা করে বলল ''না, মানে ম্যাম! খুব অপছন্দ নয়, তবে একটু একটু খারাপ লাগে।'' আজ সাহস করে কথাটা বলেই ফেলল। তন্বী এই কথা শুনে রেগে যাবার বদলে হেসে বললেন ''জানো তোমার মতো বয়সে আমি ঠিক তোমার মতো ছিলাম, পরোপকারী, বন্ধুদের সব আবদার সব জিজ্ঞাসা শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছাত আমার মাধ্যমে, তারপর একদিন সব কিছু হারিয়ে বড় একা হয়ে গেলাম। মাস্টারস্ করার পর নেট-সেট্ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যাকুল, প্রথম বারেই পেয়েছিলাম PH D করার সুযোগ। ক্রমে সময় যেতে লাগল আমি একটা করে সিঁড়ি উঠলাম আমার জীবনে পরিচত জনসংখ্যা যেন ব্যস্তানুপাতে কমতে লাগল। তারপর কেমন প্রাণোচ্ছল, সদাহাস্যময়ী নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। সেই প্রাণোচ্ছল ছাত্রীর জায়গায় জন্ম নিল এক জন রাশভারী শিক্ষিকা। মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজের বড় অপছন্দ হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনে এত উন্নতি করে কী লাভ হল? জীবনে আজ কিছুর অভাব নেই তবু যেন বড় একটা অভাব বোধে রোজ দগ্ধ হচ্ছি। প্রতিদিন যেন মন্ত্রের ন্যায় উঠে চলেছি উন্নতির শিখরে কিন্তু শিখরে যত উঠছি তত একা হয়ে যাচ্ছি।'' কথাগুলি একটানা বলে থামলেন প্রফেসর তন্বী। এতক্ষণ ওনার কথা শুনতে শুনতে অনু ভাবছিল ''এই মানুষটা যাকে সে এতটা অপছন্দ করে শুধুমাত্র তিনি গম্ভীর বলে, তার মনে এত জমানো কথা।'' কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করতে পারল না অনু, যতই হোক মানুষটি তার শিক্ষিকা। তবে অনু আজ আর একটা সাহসিকতার কাজ করল, সে ম্যামকে বলল, ''ম্যাম, দেখুন ফুচকা, চলুন ফুচকা খাই।'' তন্বী অবাক হয়েছিল। আসলে তিনি ভাবতেন যে তার মন খারাপ; খারাপ লাগা বড়ই নিজের, কারোর সাথে ভাগ করলে সে তাকে হাসির খোরাক বানাবে। কিন্তু নাহ্! এই একুশ বছর বয়েসি অনু যার মধ্যে তিনি ছোটোবেলার তন্বীকে দেখেন, সে যেন ম্যাডামকে নতুন করে বাঁচতে শেখাচ্ছে। তাই তিনিও দ্বিধা না করে নতুন ছাত্রীর মতো বললেন ''চলো''। শিক্ষিকা-ছাত্রীর সম্পর্ক সময়ের পলকে হয়ে গেল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

হঠাৎ এমন সময় কড়া গলা খাঁকরানিতে চমকে উঠল তন্বী। চমক ভাঙতে সে দেখল সে বসে আছে ক্লাসরুমে আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাডাম ঋতুজা। হতবাক দৃষ্টিতে তন্বী তাকিয়ে আছে ম্যাডামের দিকে। অবিকল ম্যাডামের চরিত্রে নিজেকে কল্পনা করছিল সে এতক্ষণ।

নাহ্, এত সাফল্য সে চায়না। যে সাফল্যে তাকে তারই স্বপ্নে দেখা ম্যাডাম তন্বীর মতো একা থাকতে হয়। ম্যাডাম ঋতুজার প্রচন্ড বকা খেয়েও সে আজ আবার তার বন্ধুমন্ডলীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আনন্দ করছে কিন্তু বিস্মিত হয়নি তার লক্ষ্য। আজ থেকে সে চেষ্টা করবে লক্ষ্য পূরণের সাথে সাথে কাছের মানুষগুলোকে যাতে সে না হারায়।

''এত উন্নতি করিয়া কি হইবে? যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে!'' — এই বলে হাস্যময়ী মুখে ছলছল চোখে নেমে এলেন মিসেস তন্বী বোস রায়, আজকে যে ওনার farewell।

✠✠✠✠✠✠✠

Alumni একটি আবেগ

অর্পিতা সরকার, প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ (২০০১-২০০৪)

দিনটা ছিল ২০২১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। ভারতীয় সময়ে বৃহস্পতিবার ঠিক সকাল ১০.৪৫ মিনিট। আমাদের বহু প্রতীক্ষিত পুনর্মিলন। মাধ্যম - গুগল মিট। করোনাকালীন আবহে বিধিনিষেধকে সম্মান জানিয়ে আমরা শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারিনি সেদিন কলেজে। কিন্তু তাতে কি! সবার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখে এতটুকুও মনে হয়নি আমরা 'ভার্চুয়ালি' মিলিত। আমাদের আবেগ সে কথা মনে রাখেনি। শ্রী শিক্ষায়তন কলেজে পা রেখেছিলাম ২০০১ সালে। দীর্ঘ ২১ বছর পরেও যখন আজও কলেজে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করি একইভাবে, তখন মনে হয় পৃথিবীতে নিজের জন্য আলাদা করে আর বিশ্ব পাবার থাকতে পারে। আমাদের বাংলা ডিপার্টমেন্ট একটা নিদর্শন আমাদের কাছে, আর একথা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, অনুভব করি। (মফঃস্বল থেকে উঠে আসা একটি মেয়ে যখন হঠাৎ করে এক বিশালতায় প্রবেশ করে, তখন কি পরিমাণ মনের জোর লাগে তা আমি প্রথমদিন অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে বুঝেছিলাম। মায়ের হাত ধরে কলেজে প্রবেশ। পা দুটো যেন ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছে। ধীর পায়ে যখন স্টেজে উঠে এলাম শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। এত 'আলো' আমি আগে কখনো দেখিনি। ম্যামেদের সামনে মার্কশীট হাতে দাঁড়ালাম। Direct Admission, মা সেদিন ওনাদের বলেছিলেন মেয়েকে দিয়ে গেলাম আপনাদের কাছে। প্রচন্ড ভীতু। ওকে আপনারা একটু তৈরী করবেন। যেন মাতা দেবকীর যশোদা মায়ের কাছে সমর্পণ। ওনারা কথা দিয়েছিলেন। আর তা যে কতটা খাঁটি তা বুঝেছি সময়ের সাথে সাথে। কাঁচা মাটির তাল থেকে পরম যত্নে মূর্তি গড়ে তুলতে হলে কি পরিমাণ অধ্যবসায় লাগে তা শিখেছিলাম ওনাদের কাছেই। কি রকম যেন 'মা-মা' গন্ধ পেতাম ১০৩ নং ঘরটায় ঢুকলে। ভয়গুলো ক্রমশ দূরে যেতে লাগলো। কলেজ bunk করার কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। অনেক যত্ন করে, ভালোবেসে আগলে রাখতেন আমাদের যাঁরা, দীর্ঘ সময় পর মুঠোফোনে তাঁদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ যেন একমুঠো আবেগ। আমরা বড় হয়েছি, মানুষ (মান + হুশ) হবার চেষ্টা করেছি, তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ করে আজও হেঁটে চলেছি। প্রতিদিনের যাপনে তাঁরা মিশে আছেন আমাদের সঙ্গে। ম্যামেদের কথা অফুরান, তাঁদের ভালোবাসার মতই। বন্ধুরা এখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছি জীবনের স্রোতে পাড়ি দিয়ে। তাই প্রথমবার যখন আমরা কলেজে একত্রিত হই তখন প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সবাই আসতে পারেনি। খুব মন খারাপ হয়েছিলো আমাদের। তাই ইন্টারনেটের দুনিয়ায় এবারে যখন মাধ্যম গুগল মিট তখন স্বাভাবিক ভাবেই সবাই উচ্ছ্বসিত। প্রবল খুশি। কোথা দিয়ে যেন ৩ ঘন্টার বেশি সময় কেটে গেলো বুঝলামই না। অফিস, বাড়ি, বাচ্চা, রাতের ঘুম জলাঞ্জলি দিয়ে ওইটুকু সময় আমরা প্রাণভরে নিশ্বাস নিলাম। অনেক দিন পর। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত সবাই। নাচে, গানে কবিতায় ভরে উঠল আমাদের আড্ডা। রাখা হলো কিছু প্রতিশ্রুতি পরের বারের জন্য। আর সাথে স্মৃতি মেদুরতায়, কি এক আবেশে মনটা হারিয়ে গেল ক্রমশ। ইচ্ছে করছিলো না টেনে-হিঁচড়ে মনটাকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সময় তো বয়ে চলবেই। সে জানায় এবার থামতে হবে। আবার অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু। কবে আবার ফিরব কলেজে? কবে আবার দেখা হবে সবার সাথে? আমার আবেগ, আমার অনুভূতিরা আমার অস্তিত্বের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় শুধুমাত্র এই 'ভালোবাসার

বাড়ি'-টায় এলে। আবার অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু। কবে পাব আবার আপনাদের স্পর্শ ম্যাম? আজ অর্ধপরিণত বয়সে দাঁড়িয়ে মনে হয় এখনও তো অনেক কিছু শেখা বাকি! অনেক কিছু জানা বাকি ! অনেক কিছু পাবার আছে এখনো আপনাদের কাছে। অনেক কিছু...। আমার এই ছোট্ট হাতের মুঠোয় কি করে আমি ভরব তাকে !

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।।"

কানে বেজে চলেছে একটানা কিছু সুর এখনো। নাঃ ! আজও হারিয়ে যায়নি সেসব। কিছু হারিয়ে যায় না। অক্ষত থাকে সব মনের গোপনে।

✠✠✠✠✠✠✠

প্রাক্তনী সম্মেলন (২০২১) সম্বন্ধে কিছু কথা

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ (২০০১-২০০৪)

গত বছর ৩০/১২/২১ ভারতীয় সময় সকাল ১১.৩০ টার সময় অনলাইনে Google meet-এর মাধ্যমে আমাদের alumni meet হয়। অনলাইনে হওয়ার দরুন আমরা অনেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিটে যোগ দিতে পেরেছিলাম। প্রায় এক যুগ পর সব বন্ধুদের সঙ্গে, ম্যাডামদের সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো। অন্য ব্যাচের প্রাক্তনীদের সাথে আলাপ হলো। সেদিন কয়েক-ঘন্টার জন্য ফিরে পেয়েছিলাম আমার কলেজ জীবন। আমেরিকা প্রবাসী হওয়ায় আগের কোনো মিটেই অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়নি। এইবার শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল অনলাইন মিট হয়েছিল বলেই। অধীর অপেক্ষায় আছি আবার কবে অনলাইন মিট হবে আর সবার সাথে আবার যোগাযোগ হবে।

✠✠✠✠✠✠✠

দশাবতার তাস তথ্য

দেবলীনা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

পুরাণ মতে বিষ্ণু জগতের পালনকর্তা। ইনিই বিশ্বপিতা। যুগে যুগে অধর্মের বিনাশ করতে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার জন্য, পৃথিবীকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি নানান অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণে বিষ্ণুর দশটি অবতারের কথা বলা হয়েছে — মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, কল্কি। অনুমান করা হয়, গুপ্তযুগে বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে গ্রহণ করা হয়েছে, দুটি ধর্মের সম্মিলনই এর মূল কারণ। আবার কোথাও কোথাও কৃষ্ণকে দশাবতারের তালিকা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। হিন্দু পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিটি অবতারেরই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে বিষ্ণুর দশাবতারের চিত্র অঙ্কিত তাস যে একসময় বাংলাদেশের মল্লরাজবংশের রাজাদের খেলার উপকরণ ছিল, সেটা হয়তো বিষ্ণুপুর না গেলে জানতে পারতাম না।

বাঁকুড়া জেলার মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের প্রাচীণ নাম ছিল মল্লভূম। অবশ্য মল্লভূম নামক জায়গাটি শুধুমাত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, আরো বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলের এমন নামের কারণ হল এখানে রাজত্ব করতেন মল্ল বংশের রাজারা। অনেকের মতে প্রায় হাজার থেকে বারোশ বছরেরও বেশি সময় পূর্বে এই মল্লবংশের উনিশতম রাজা জগৎ মল্ল এই দশাবতার তাস খেলার সূচনা করেন। আবার কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন রাজা বীর হাম্বির এই খেলার প্রচলন করেন। তবে যে রাজাই এই খেলার প্রচলন করে থাকুন না কেন, মল্ল রাজবংশে দশাবতার তাস খেলাটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। মল্লরাজার আদেশে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত লাউগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা শ্রী কার্তিক সূত্রধর দশাবতার তাস তৈরি করেন। সূত্রধর পরিবার থেকেই এই তাস রাজপ্রাসাদে সরবরাহ করা হত। প্রাচীনকালে এই খেলাটির নাম ছিল 'ওরক' খেলা। পরবর্তীকালে খেলাটির নাম হয় 'দশাবতার তাস খেলা'। এই তাসগুলিতে বিষ্ণুর দশাবতারের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে আর সেই সঙ্গে রয়েছে নম্বরের চিহ্ন। তবে এই তাসে বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে জগন্নাথকে দেখা যায়। এখানে মোট তাসের সংখ্যা ১২০টি, এবং পাঁচজন মিলে এই খেলাটি খেলা হত। পরবর্তীকালে রাজারা দশাবতার চিত্রিত তাস ছেড়ে 'নক্স' বা 'নক্সা' তাস খেলা শুরু করেন। এতে মোট ৪৮টি তাস রয়েছে, আর এই তাসগুলিতে কোনো দেবতার চিত্র ছিল না।

তবে রাজা, রাজবংশ বা তাঁদের বিলাসিতার কথা আমি আজ বলব না। আমি এখানে তাঁদের কথা বলব যাঁদের কথা ইতিহাসে হয়তো বলাই হয়নি, অথবা খুব কম বলা হয়েছে। দিনরাত পরিশ্রম করে যাঁরা রাজা ও রাজবংশের মানুষদের, তথা উচ্চশ্রেণির মানুষদের বিলাসিতার আয়োজন করতেন, তাঁরাই আজ আমার এই রচনার বিষয়।

যে দশাবতার তাসের কথা বললাম, এই দশাবতার তাস সারা পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের একটিমাত্র পরিবারের সদস্যরাই তৈরি করে থাকেন, এঁরাই এই শিল্পের প্রকৃত শিল্পী এবং প্রথম থেকে এঁরাই এই তাসগুলি তৈরি করে আসছেন। এঁরা শ্রী কার্তিক সূত্রধরের বংশধর। এই বংশের অন্যতম বংশধর শ্রী বাঁশরী ফৌজদারের সঙ্গে পরিচয় হয় বিষ্ণুপুর গিয়ে। তাঁর কাছ থেকেই তাঁদের বংশের ইতিহাস আমি জানতে পারি। আর এতক্ষণ মল্লরাজবংশ আর দশাবতার তাস সম্পর্কে যা বললাম সেসবই বাঁশরীবাবুর কাছ থেকে শোনা। তিনি এই বিষয়ে প্রচুর তথ্যও আমাকে দেন। তিনি বলেন,

একসময় তাঁদেরই কোনো এক পূর্বপুরুষ রাজবংশের সেনাপতির পদ লাভ করেন, যাঁর ফলে তাঁদের উপাধি হয় ফৌজদার। ওঁর মতে, ফৌজদার পরিবারের পূর্বপুরুষরা মল্লরাজবংশের রাজশিল্পী ছিলেন।

তবে এই প্রাচীন হস্তশিল্প, বিষ্ণুপুরের এই ঐতিহ্য বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। তাই ফৌজদার পরিবারের সদস্যরা, যাঁরা এই শিল্পের একমাত্র প্রকৃত কারিগর, তাঁরা প্রত্যেকেই এই বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত ও দুঃখিত। তাঁরা বহু কষ্ট করে এখনও এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কারণ এই ফৌজদার পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, এবং এই শিল্পকে তাঁরা ভালবাসেন, তাই আগলে রেখেছেন। বাঁশরীবাবু, তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা মৌসুমী ও সুইটি, সকলেই এই কাজে সমান দক্ষ। তবে দুঃখের বিষয় হল এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁরা কোনোরকম সাহায্য বা সুবিধা পান না, সেরকম প্রচারও নেই। তাঁদের কথা অনুযায়ী, বিষ্ণুপুরের বাইরে তো দূরের কথা, বিষ্ণুপুরেই অনেক মানুষ জানেন না এই শিল্পের কথা, তাঁদের পরিবারের কথা। তাই সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। বাঁশরীবাবু বলেন যে, বিষ্ণুপুরে আরো কয়েকটি দোকানে এই তাস পাওয়া গেলেও সেগুলি প্রকৃত নয়, নকল। তাই সেসব অসাধু ব্যবসায়ীদের থেকে ক্রেতাদের সাবধান থাকা উচিত। কারণ তাঁদের পরিবার ছাড়া এই তাস আর কেউ তৈরি করেন না।

বাঁশরীবাবুর পিতা শ্রী সুধীর ফৌজদার বিশ্বভারতী কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পান। শুধু তাই নয়, একসময় বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরের অষ্টধাতুর রাধা বিগ্রহটি চুরি হয়ে যায়, তখন নতুন মূর্তি সুধীরবাবু তৈরি করেন। এই কথা খুব কম মানুষই জানেন। বাঁশরীবাবুও বিশ্বভারতীর কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন। অথচ তাঁদের মত গুণী মানুষ আজও লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গেছেন।

বিষ্ণুপুরের এই শিল্পী পরিবারটির খ্যাতির শীর্ষে থাকার কথা ছিল, কিন্তু সেই প্রাপ্য খ্যাতি বা সম্মান তাঁরা পান নি। এত অপ্রাপ্তি সত্ত্বেও, এই পরিবারটি বাংলার একটি শিল্প বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা, এই লড়াই আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। একটি দশাবতার তাসের সম্পূর্ণ বাণ্ডিল তৈরি করতে প্রায় দেড় মাস সময় লাগে। আর এই তৈরির প্রক্রিয়া যথেষ্ট কষ্টসাপেক্ষ। প্রচুর শ্রম, ধৈর্য ও কষ্ট সহকারে তৈরি করতে হয় এই দশাবতার তাস। এই তাস তৈরিতে খরচও হয় যথেষ্ট। তাই এর বিক্রয়মূল্যও কিছু কম নয়। তবে এই শিল্পের ঐতিহাসিক মূল্য ও মর্যাদা যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এই মূল্য বা মর্যাদার কথা ক'জনই বা জানেন! প্রচারের অভাবে এমন শিল্প ও শিল্পীরা এমনভাবে অপরিচিত হয়ে অন্ধকারে থেকে গেছেন। ইন্টারনেটে এই তাসের কথা থাকলেও সেভাবে প্রচারিত হয়নি, ফলে এই শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে মানুষ ভালভাবে জানতে পারে না।

বাংলার অনেক শিল্পই বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। সেই অনেক শিল্পের মধ্যে দশাবতার তাসের অস্তিত্বও আজ সঙ্কটে। শুধুমাত্র ফৌজদার পরিবারই এই শিল্পের প্রকৃত কারিগর এবং রক্ষাকর্তা। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই শিল্প রক্ষা করার। খ্যাতি, যশের আকাঙ্ক্ষা না করেই এঁরা এই শিল্প দিনের পর দিন সৃষ্টি করে চলেছেন। বাংলার এই মূল্যবান শিল্পসম্পদ যাতে হারিয়ে না যায় এটাই কাম্য। বাংলার একটি বিশেষ শিল্প, যা এক অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সম্পদও বটে, তার কথা জানানোই আমার এই রচনার মূল উদ্দেশ্য। বাংলার মানুষ শিল্প ও সংস্কৃতির মূল্য বোঝেন, তাই আমি এই লুপ্তপ্রায় শিল্প সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি ততটুকু জানাবার চেষ্টা করলাম। কারণ বাংলার ঐতিহ্য, শিল্প, সংস্কৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের রয়েছে। আর দশাবতার তাস শুধু বিষ্ণুপুরের নয়, সমগ্র বাংলার শিল্প ও সম্পদ, বাংলা ও বাঙালির গর্ব।

‘কমেডি অফ এররস’ বনাম ভ্রান্তিবিলাস; অনুবাদক হিসেবে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব

সৃজিতা ব্যানার্জী, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

অনুবাদ, কম বেশি আমরা সকলেই পরিচিত এই শব্দবন্ধের সঙ্গে। ছোটবেলায় করা বাংলা থেকে ইংরাজীতে, কিংবা ইংরাজী থেকে বাংলায় ‘Translation’ কিন্তু একেবারেই ছেলেখেলা। ‘Translation Studies’ বা ‘অনুবাদ সাহিত্য’ কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক কনসেপ্ট।

আমরা যখন মূল গ্রন্থ (Source Text) থেকে অনুবাদ করি, আমাদের মাথায় রাখতে হয়, নির্বাচিত গ্রন্থটি (Target Text) কোন পারিপার্শ্বিকতার অধীন। তার সামাজিক অবস্থান কেমন, সেই মুহূর্তে সেই জায়গায় সাহিত্যিক চাহিদা (Horizon of Expectations) কেমন, কিভাবে অন্য ভাষার গ্রন্থ দ্বিতীয় ভাষায় গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে, ইত্যাদি নানান বিষয়ে।

এমনকি একটি নির্দিষ্ট স্থানের গ্রন্থ, অনুবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারে অনুবাদকের স্বতন্ত্র গুণে, তাতে কিন্তু মূল গ্রন্থের লেখকের কৃতিত্ব, মোটেই ক্ষুণ্ণ হবে না। বরং তিনি আরো বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করবেন।

বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের ভান্ডারকেও সমৃদ্ধ করেছেন। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাঙালির অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসেও নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী নাম। শেক্সপিয়ারের ‘কমেডি অফ এররস’ কে কিভাবে তিনি ‘ভ্রান্তিবিলাস’-এ রূপান্তরিত করে, বাঙালির ঘরের সঙ্গী করে তুললেন, সেটিই এখন আলোচ্য বিষয়।

‘ভ্রান্তিবিলাস’ রচনার সময়কালের দিকে যদি আমরা তাকাই, দেখব যে এটি বাংলার নবজাগরণের সময় রচিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের যে অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন, সেই নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই নবজাগরণের সময় অন্যান্য সমাজসংস্কারকের মত, বিদ্যাসাগরও চাইলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে দেশীয় শিক্ষার মেলবন্ধন প্রয়োজনীয়।

কারণ, বাংলা সংস্কৃতি বড্ড গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার থেকে মুক্তির উপায় হল শিক্ষা। দেশীয় নমুনা তো বটেই, বিদেশী সাহিত্যকে দেশীয় উপাদানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি উদ্যত হলেন।

শেক্সপিয়ার, এক সাহিত্য সংগ্রহশালা। তাঁকে নিয়ে বলা যেতেই পারে, যা নেই স্ফিয়ারে, তা নেই শেক্সপিয়ারে...তাই উনিশ শতকের ‘ইন্টেলেকচুয়াল’ সমাজ-বৃত্তের মধ্যে যে, শেক্সপিয়ার এক এবং অদ্বিতীয় কেন্দ্র হতে পারে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই। বিদ্যাসাগরেরও তাই পছন্দের তালিকায় রইলেন স্বয়ং মহাকবি। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ আস্তে আস্তে এর মধ্যে শেক্সপিয়ারকে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। ঠিক এমন সন্ধিক্ষণে, শুরু হতে লাগল শেক্সপিয়ারকে নিয়ে পরিগ্রহণ ও অনুবাদ।

বিদ্যাসাগর রচনা করে ফেললেন, শেক্সপিয়ারের ‘কমেডি অফ এররস’-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ, ‘ভ্রান্তিবিলাস’। বলাবাহুল্য, এখনো ‘ভ্রান্তিবিলাস’-এর জনপ্রিয়তা দেখলে বোঝা যায়, উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ এই অনুবাদকে কতটা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

‘কমেডি অফ এররস’ নাটকের আকারে লেখা হলেও, ‘ভ্রান্তিবিলাস’ হয় গদ্যের আকারে লেখা। তাই প্রত্যেকটি ঘটনার

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রেরিত হয় এই অনুবাদে, যার সমগ্র বিবরণ শেক্সপিয়ারও তার রচনায় দেননি। আরও একটি মজার ব্যাপার, 'কমেডি অফ এররস' শেক্সপিয়ারের পুরোপুরি মৌলিক ভাবনা ছিল না। রোমান সাহিত্যিক প্লটাসের তিনটি নাটকের বিষয় নিয়ে শেক্সপিয়ার তাঁর রচনার, ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন প্লটাসের 'Menachmi', 'Amphitryon' এবং 'Apollonius' প্রভৃতি নাটক থেকে বিভিন্ন অনুষঙ্গ গ্রহণ করে 'কমেডি অফ এররস'-এর কাহিনী বুনেছেন। 'কমেডি অফ এররস'-এর কাহিনীর প্রেক্ষাপট, মূলত 'Menachmi' থেকে গৃহীত। যেখানে মেনাকমাস এবং সসেজ দুই সাদৃশ্যমান যমজ ভাই, ঘটনাক্রমে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, এবং তাদের নিয়ে আবর্তিত হয়ে চলে হাস্যরসে পূর্ণ কৌতুক বাতাবরণ। প্লটাসের এই একজোড়া যমজের বদলে, শেক্সপিয়ার দুজোড়া যমজের উপস্থিতি ঘটান। তিনি আসলে পাঠকবর্গের চাহিদা অনুভব করতে পারেন। তাই তাঁর রচনাকে আরো উত্তেজক ও হাস্যস্পদ করে তুলতে, বলাবাহুল্য এক প্রকার জটিল আঙ্গিককে প্রাধান্য দিতে দু'জোড়া যমজ-এর আবির্ভাব ঘটান। ফলে চরিত্রের ঘনঘটায় ঘটনা আরো বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর দেশীয় উপাদনে উজ্জীবিত করার সাথে, অনুবাদটির যে নাম দেন 'ভ্রান্তিবিলাস' তাও খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। 'ভ্রান্তিবিলাস' অর্থাৎ ভ্রান্তিও যেখানে বিলাসিতা! ভ্রান্তির ফলেই যেখানে কেবল ঘটনার ঘনঘটা। বিদ্যাসাগর 'কমেডি অফ এররস'-এর নাটকীয় জঁর পরিবর্তন করে, 'ভ্রান্তিবিলাস'কে গদ্যাকারে প্রতিষ্ঠা করলেন, অর্থাৎ 'ক্রস জেনেরিক' ঘটালেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলত যা হয়, মূল গ্রন্থের সব রকম উপাদান, নির্বাচিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। নির্বাচিত গ্রন্থটি গড়ে ওঠে অনুবাদকের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি গাঠনিকতাকে কেন্দ্র করে। তাই 'ভ্রান্তিবিলাস' যে ব্যতিক্রম হবে না, এটাই স্বাভাবিক। সমালোচকেরা অনেকেই বলেছেন, এখানে শেক্সপিয়ারকে নাকি বিকৃত করা হয়েছে! কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। 'ভ্রান্তিবিলাস' কে বিদেশি 'কনটেক্সট'-এর ওপর দাঁড় করিয়েই, দেশীয় উপাদানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বলা যায়, 'কমেডি অফ এররস'-এর একটি ভারতীয়করণ হল 'ভ্রান্তিবিলাস'। এই পরিবর্তনটি অনুবাদককে, তার পারিপার্শ্বিকতার প্রাসঙ্গিকতার কথা ভেবেই করতে হয়েছে। তা না হলে তার অনুবাদ কার্যই বৃথা যেত! প্রেক্ষাপট এক রেখেই, অনুবাদক বিদ্যাসাগর চরিত্রগুলির 'socio-political' বিভিন্ন পরিবর্তন এনেছেন এবং এমনভাবে স্থান-কাল-পাত্রের নাম বদল করেছেন, যাতে তাঁরা বাঙালি বৃত্তের আত্মীয় হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগর, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তোমায় রচনা' গোছের মনোভাব থেকে, শেক্সপিয়ার রচনার দেশীয়করণ করে, শেক্সপিয়ারকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। যেমন 'কমেডি অফ এররস'-এ মালিক ভৃত্য জুটি সাইরাকিউসের আন্টিফোলাস ও ড্রমিও, 'ভ্রান্তিবিলাস'-এ হয়েছে হেমকূট নগরের চিরঞ্জীব ও কিংকর। বোঝাই যাচ্ছে বিদ্যাসাগর কেন স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কারণ বিদেশি আমেজের চেয়ে দেশীয় আমেজেই যে তাঁর দেশীয় পাঠক মজবেন, তা একজন লেখক তথা অনুবাদক ঠিক খেয়াল রাখেন। অনুবাদ একটি ভাষান্তরীকরণ প্রক্রিয়া। ভাষার পরিবর্তন মানে অনুদিত নমুনার ভৌগোলিক, সামাজিক ইত্যাদি পরিবর্তন খুবই প্রাধান্য পায়।

বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেও, শেক্সপিয়ারের মত গুরুগম্ভির আঙ্গিক তিনি অবলম্বন করেন নি। খুব সহজ-সরল ভাষায় মেদহীন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এছাড়াও আমি আগেই বললাম যে, অনুবাদ করার সময় হুবহু মূল গ্রন্থ প্রতিফলিত হয় না নির্বাচিত গ্রন্থে, কারণ সেখানে অনুবাদকের পারিপার্শ্বিকতা, স্বতন্ত্রতা নির্ভর করে। সেরকম 'ভ্রান্তিবিলাস'-এও, বিদ্যাসাগর দেশীয় আবহের কথা ভেবে, অনেক সূক্ষাতিসূক্ষ পরিবর্তন করেছেন। যেমন 'কমেডি অফ এররস'-এ দেখা যায়, ইফিসাসে, সাইরাকিউসের ইজিয়ানের যাতায়াতে, নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য ইফিসাসের ডিউক সূর্যাস্তের আগে তার থেকে হাজার 'মার্কস' জরিমানা চান এবং নিঃস্ব অসহায় ইজিয়ান ডিউককে একশো মার্কসের বেশি দিতে পারেন না। উল্টোদিকে 'ভ্রান্তিবিলাস'-এ নিষিদ্ধ জয়স্থলে প্রবেশ করার অপরাধে হেমকূটের সোমদত্তর থেকে জয়স্থলের রাজা পাঁচশত টাকা জরিমানা চান এবং সোমদত্ত দুইশত টাকা দিতে সক্ষম হন। ঠিক এখানেই দুই ঘটনার অর্থনীতির এই বিভাজন দুই ভিন্ন আর্থসামাজিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করেছে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, তাই উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে তখনকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে টাকার বিভাজন দেখানোটা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবিক। এছাড়াও হয়তো তার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশী সংস্কৃতি যে তখন সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, তা উনিশ শতকের মানুষের কাছে স্পষ্ট করা। তাই 'কমেডি অফ এররস'-এ ডিউক, নিরপরাধ অসহায় বৃদ্ধ ইজিয়ানের কাছে যখন বিপুল পরিমাণ অর্থের দাবী করেন, বিদ্যাসাগরের লেখনীতে সোমদত্তের কাছে তা পাঁচশত মুদ্রা দাবি করায় পরিণত হয়, যা অনেক মানবিক। আর একটা দিকও হতে পারে, বিদ্যাসাগর হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন, ভারত ইংরেজ অধিকৃত হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংরেজি তুলনায় অনেক স্বচ্ছল ছিল, আবার 'কমেডি অফ এররস' এ ঝড়ের সময় ইজিয়ান ও তাঁর স্ত্রী এমিলিয়া পুত্রসমেত একটি মাস্তুলের, দুপ্রান্তে আশ্রয় নেন এবং ঘটনাচক্রে সেই মাস্তুল বা গুণবৃক্ষ ভেঙে দুই প্রান্ত দু দিকে চলে যায়। বিদ্যাসাগর একটি মাস্তুলের বদলে দুটি মাস্তুলের আশ্রয় করে, সোমদত্ত ও তাঁর স্ত্রী লাবণ্যময়ীর বিচ্ছেদকে, আরো জোরালো করে তোলেন। যাতে তাঁর পাঠককে গোটা দৃশ্যটি সহজে বোধগম্য করানো যায়।

লক্ষণীয়, ইফিসাসের আন্টিফোলাস ও তাঁর স্ত্রী আড্রিয়ানার নাম শুরু হয় একই অক্ষর দিয়ে, আবার 'ভ্রান্তিবিলাস'-এ জয়স্থলের চিরঞ্জীব ও স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার নামের শুরুও একই অক্ষর দিয়ে। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর শেক্সপিয়ারের দিকটি বজায় রেখেছেন! শুধু তাই না, বিদ্যাসাগর চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিকতাও শক্তিশালী দেখিয়েছেন। চন্দ্রপ্রভা আড্রিয়ানার থেকে অনেক স্নেহকাতর এবং স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। আড্রিয়ানা সেই তুলনায় কঠোর, আবেগহীন। বাঙালি বধূকে এইরূপ মানায় না, তাই বিদ্যাসাগর চন্দ্রপ্রভার মধ্যে সেই 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়েই বাঙালি সমাজের যথোপযুক্ত রচনা করেছেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মূল গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধরনের অভিসম্পাত লক্ষ্য করা যায়, যা বেশিরভাগই স্ত্রী জাতি কেন্দ্রিক, এবং শ্রুতিকটু। বিদ্যাসাগর স্ত্রী জাতির অসম্মান হয় এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ করেননি, বরং তাঁর প্রদত্ত অভিসম্পাত গুলি হাস্যরস সৃষ্টি করে।

শেক্সপিয়ার তার কোন চরিত্রকে পূর্ব পরিচয় প্রদান করেননি কিন্তু অপরপক্ষে বিদ্যাসাগর যেকোনো চরিত্রেরই পূর্ব পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। যেমন শেক্সপিয়ার 'ডক্টর পিঞ্চ' চরিত্রকে কেবল 'স্কুল মাস্টার' সহযোগে উপস্থাপন করেছেন নাটকে। সেখানে বিদ্যাসাগর সেই চরিত্রকে 'বিদ্যাধর' নাম দিয়ে, তিনি কীভাবে একই সঙ্গে দুটি পেশার ধারক, সেই হিসেবে যথেচ্ছভাবে পূর্ব পরিচয় প্রদান করেছেন, এবং 'বিদ্যাধর' নামটি নিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রদত্ত মশকরা, চরিত্রটির উপস্থিতিকে বেশ কৌতুকপূর্ণ করে তুলেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, বিদ্যাসাগর কখনো চাননি তাঁর এবং শেক্সপিয়ারের তুলনা করা হোক। একজন সক্রিয় নব যুগের প্রধান প্রাণ পুরুষ হিসেবে, কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দেশের আদলে, তিনি সমাজের সব স্তরে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এই গ্রন্থে প্রথম পৃষ্ঠায় শেক্সপিয়ারের প্রতি তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হয়েছে, সুতরাং যে শেক্সপিয়ার শুধু বাঙালি শিক্ষিত মহলেই কেবল আবদ্ধ ছিলেন, তাঁকেও সর্বজনের সান্নিধ্যে আনা এবং বাঙালিকে শিক্ষা প্রদান যে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল, উভয়ই সাফল্য লাভ করেছে।

আমরা যারা লাল গোলাপী

সমৃদ্ধা ঘোষ, ইংরেজি বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

জাহান্নমের জগত জুড়েও
রং রয়ে যায় গোলাপী,
রক্ত আছে, রক্তিম তার
হাহাকার শোনা কি?

দুহাতে রাইফেল ভরে, ও হাতেই কাজল পরে,
এখানেই, এ হাত দিয়েই ঝরে আতপ, বাসমতি।

এ নগরী আঁধার এখন
কৃষ্ণাভ বার বিষ মেশে মেঘে,
পাথর মুখো ধূসর মানব
পড়ছে খসে উল্কাপাতের বেগে।

তবুও কারা আগুন ফুল, তবুও কারা পলাশ দেয়...
তবুও কারা রাঙা হয়, তবুও কারা অপেক্ষায়।

অমন কারা লাল গোলাপী?
মার খেয়ে না সেহাগে?
অমন কারা রক্তে রাঙা?
অশ্রু জলের করুণ রাগে?

আমরা যারা আগাছা-রা, আমরা যারা অসময়ের,
বিকেলে ভোরের ফুল, কাগজের, সবিনয়ের।

আমরা লাল গোলাপী, ব্যর্থ রক্তকরবী,
আঁধারের প্রতিপক্ষ, মিছিলের খেয়াল-কবি।

আমাদের এ জমিন সবার, আমাদের রাস্তা কঁটার,
একার বলতে আছে আস্ত নদী।
কেউ করে খোঁজ ভালবাসার,
কেউ বা খোঁজে ভাত, রুটি।

তবুও কি মেঘ দেখলে আমাদের বৃষ্টি পায়না?

মাটি

রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার

'মাটি' শব্দটি ছোটো হলেও তার জীবন অনেক বড়ো পৃথিবীর বুকের ওপর যুগের পর যুগ ধরে সে শুয়ে রয়েছে। তার পরিধিও বৃহৎ। শত শত যুগের ওপর ঘটে থাকা নানান ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই 'মাটি'। ঐতিহাসিক কালে ঘটে থাকা বহুযুদ্ধের ফলে বহু মানুষের মৃতদেহ মিশে এবং রাজনৈতিকের নানান দলাদলিতে ও সামাজিকের বিভিন্ন কারণের জন্য হারিয়ে যাওয়া নানান মানুষ ও তাদের সম্পর্কের বেড়াজালে মিশে গিয়ে 'মাটি' যেন এক জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। 'মাটি'-র মধ্যে মিশে থাকা ছোটো ছোটো নুড়ি-পাথরগুলে সেই সাক্ষীর এক একজন জনতা হয়ে উঠেছে। কালো-খয়েরিতে মেশা সেই 'মাটি' যেন অনেককিছুর সুখ-দুঃখের-স্মৃতিচারণ করিয়ে দেয়। অনেক অজানা রহস্যের জাল উন্মোচন করেন ভূ-বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে থেকে। বচরের পর বছর ধরে চলে আসে সেই পরীক্ষা। তাই 'মাটি' নিয়ে মানুষের মনে কৌতুহলের শেষ নেই।

ছোটো ছেলেমেয়েরা শৈশবে ধুলো-মাটিতে মিশে যখন খেলা করে খেলা করে তার স্মৃতি যেন বড় হলে 'মাটি' তাদের মনে করিয়ে দেয়। 'মাটি'-কে আঁকড়ে ধরে সবাই বাঁচতে চায়। পশু-পাখি থেকে শুরু করে কীটপতঙ্গ এবং মানুষ পর্যন্ত সেই তাকে ধরেই বাঁচে। সে দেশেরই 'মাটি' হোক ও বিদেশেরই। পৃথিবীতে 'মাটি' কেউ বাঁচতে পারে না। তার ওপর বৃহৎ অট্টালিকা-প্রাসাদ থেকে শুরু করে ছোটো-বড়ো বাড়ি ঘর গড়ছে-ভাঙছে। কিন্তু স্মৃতি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে সে। সেই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কতকিছুই না পৃথিবীতে হয়ে চলেছে। সূর্যের তাপ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক করে ঝড়-জল, বৃষ্টি প্রমুখ আরো কত কিছু সহ্য করে চলেছে সে। তার কোনোদিন মৃত্যু নেই। কিন্তু তার মধ্যে মিশে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে পশু-পাখির, মানুষের মৃতদেহ। ফলে তার মৃত্যু নেই। কিন্তু অপরের মৃত্যু তার মধ্যে মিশে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য।

সেই 'মাটি-তেই চারাগাছ থেকেই জন্ম নেয় সহস্র বৃক্ষ। যার ফলে চারিদিক সবুজ হয়ে ওঠে। বজ্র-বিদ্যুৎ-এর ফলে যখন গাছের পাতা গাছসহ ভেঙে পড়ে তখন তারা 'মাটি'-তেই ধীরে ধীরে মিশে যায়। আবার বীছন পুঁতলে সেখান থেকেই নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মেশে ওই এক জায়গায়। তাই পৃথিবীতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-এ যা কিছু ঘটবে বা ঘটে চলেছে তার সবকিছুরই শেষ হবে সেই 'মাটি'-তে।

বিভাগের কথা

জুলাই ২০২১ — জুন ২০২২

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অন্তর্জালে পালিত হয় বাইশে শ্রাবণ ঃ রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান। বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রাবণী পাল। ‘‘রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনা ঃ প্রসঙ্গ পল্লীপুনর্গঠন” বিষয়ে তার মননশীল এবং তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর কলেজের অনলাইন প্লাটফর্ম ‘impartus’-এর মাধ্যমে পালিত হয় অ্যাক্টিভ লার্নিং ডে (শিক্ষা দিবস)। বিভাগের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে।

বছরের একেবারে শেষে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১, অতিমারি-র আবহে আন্তর্জালিক মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় বিভাগের প্রাক্তন সম্মেলন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ছাত্রীদের যোগদানে এই সম্মেলন হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত আন্তরিক এবং প্রাণোচ্ছ্বল।

২০২২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিশেষ দিনটিতে অন্তর্জালের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ডক্টর মনন কুমার মণ্ডল। ‘‘একুশের দেশ — কল্প ও বাস্তবের সীমারেখা” বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত এবং তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য আমাদের ভাবনার জগতকে বিস্তৃত করে। অধ্যাপক মন্ডলকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা।

ভাষাদিবসের এই অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল কলেজের বাংলা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জালিক মাধ্যমে সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করে। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন বিএড বিভাগের বাংলার লেকচারার শ্রীমতি ভাস্বতী বোস। বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রতিশ্রুতিমতো পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখাগুলি ২০২২ সালের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রইল আমাদের শুভ কামনা।

১১ এপ্রিল, ২০২২ শুরু হলো বিভাগের একটি নতুন কার্যক্রম ‘‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি”। আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, বিজ্ঞাপন এবং অণুগল্প লিখন এই পাঁচটি বিষয়ে আন্তর্কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অসাধারণ সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করে। শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, বেথুন কলেজ, আশুতোষ কলেজ, যোগমায়া দেবী কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, ম্যাকাউট ইউনিভার্সিটি প্রমুখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করে।

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকরা ‘সাহিত্য ও সস্কৃতি’র বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডক্টর মন্দার মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগের ডক্টর দেবলীনা সিনহা, রসায়ন বিভাগের ডক্টর অগ্নিতা কুন্ডু, ইংরাজি বিভাগের দেবলিনা গুহ ঠাকুরতা, বি.এড বিভাগের ভাস্বতী বোস এবং সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের ময়ূখ লাহিড়ী। এঁদের প্রত্যেককে বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভবিষ্যতে বিদ্যালয় স্তরে এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে আমরা আগ্রহী।

২৫ জুন ২০২২ থেকে শুরু হয়েছে বিভাগের একটি নতুন উদ্যোগ 'বিভাগীয় আলাপচারিতা'। প্রথম বক্তা ছিলেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী বর্তমান দ্বাবিরজঙ্গল বনমালী বিদ্যাভবন (সন্দেশখালি)-র প্রধান শিক্ষক ডক্টর সূর্যতপা চ্যাটার্জী। এ ধরনের অনুষ্ঠান পরে আরো করার অঙ্গীকার রইল।

বিভাগীয় পত্রিকার জন্য আমরা বেশ কয়েকটি আমন্ত্রিত লেখা পেয়েছি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক গত বছর (২০২১) আমাদের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের মাননীয় বক্তা ছিলেন। তিনি এবার বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার জন্য একটি মূল্যবান লেখা দিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর বীথি সরকার ভ্রমণবিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রাবণী পাল '২২ শ্রাবণ ঃ রবীন্দ্র স্মরণ' (২০২১) অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের একটি লিখিত রূপ আমাদের পাঠিয়েছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর অর্পিতা ভট্টাচার্য্য সত্যজিৎ রায় বিষয়ে একটি ভিন্নধর্মী লেখা দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রম্যাণি চ্যাটার্জির একটি লেখা আমরা প্রকাশ করছি আমাদের পত্রিকায়। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানের সহকর্মী এডুকেশন বিভাগের অতিথি অধ্যাপক সৌমিতা মিত্র একটি লেখা দিয়েছেন। তাকে আমাদের শুভকামনা। বিভাগের প্রাক্তন দুই ছাত্রী দেবলীনা দাশগুপ্ত এবং সৃজিতা ব্যানার্জি দুটি লেখা দিয়েছেন। তাদের জন্য রইলো অনেক শুভকামনা। এছাড়া বর্তমান ছাত্রীদের লেখা এবং এই বছরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রাপ্ত লেখাগুলি প্রকাশ করা হলো এই সংখ্যায়।

বিভাগের এই সমস্ত কাজ সম্ভব হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অদিতি দে এবং কলেজ পরিচালন কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায়। তাঁদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যক্ষ ডক্টর অদিতি দে প্রতিটি কাজে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভাগীয় অনুষ্ঠান (২০২১–২০২২)

ভাষাদিবস
২০২২

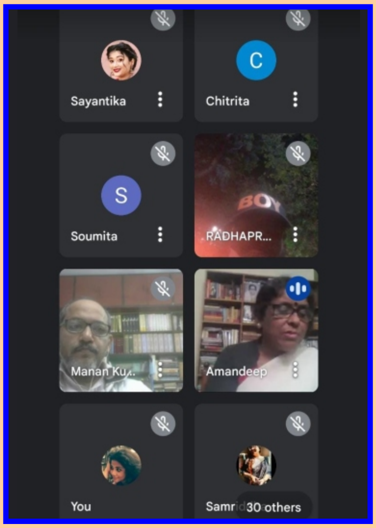

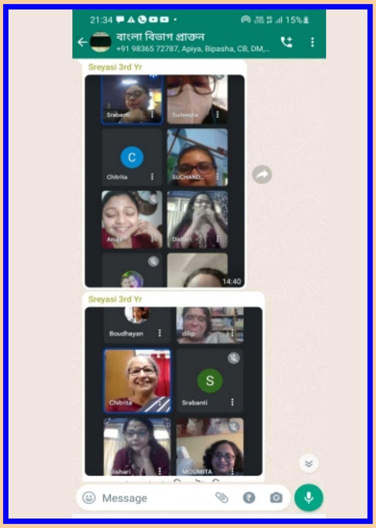

প্রাক্তন
সম্মেলন

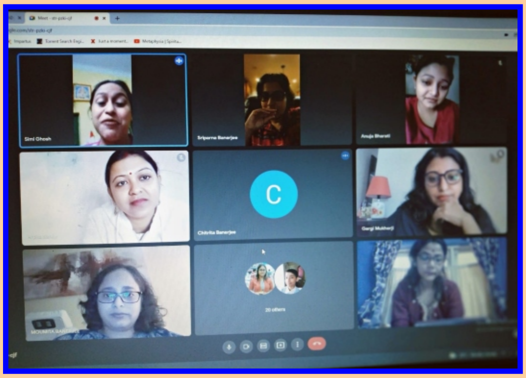

২২শে শ্রাবণ ঃ রবীন্দ্র স্মরণ